অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা

নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। —রবীন্দ্রনাথ ঃ ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্যের ভূমিকা।
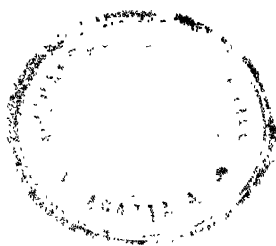
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

RABINDRA NATYA SAMIKSHA
A critical study of Tagore's 'Sacrifice', 'King and Queen', 'Malini' and 'Tapati'.
Price Rs. 5·00 (Rupees Five only)

By Prof. Kanak Bandyopadhyay

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজিং ডিরেকটার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীপঞ্চমী, ১৯৫০
মূল্য ঃ ৫·০০ (পাঁচ টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট ঃ শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
এ. জি. প্রেস.
৪, পার্শি বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

॥ উৎসর্গ ॥

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

স্মরণে

॥ নিবেদন ॥

বাংলা ১৩৬২ সালের ২৫-এ বৈশাখ আমার লেখা 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে কবির রূপক-সাংকেতিক সকল নাটকের বিশ্লেষণ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সর্ববিধ সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার নাটক আমাদের সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। সেই কারণে বর্তমান গ্রন্থে রূপক সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত নয়, এমন চারখানি নাটকের বিশ্লেষণ ও মর্মোদ্ঘাটন করার জন্য প্রয়াসী হইলাম। এখানে 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী' ও 'তপতী'—এই চারিটি নাটকের আলোচনা আছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে একখানি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করার বাসনাও রহিল।

এই গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ—'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী' সম্বন্ধীয় আলোচনা দুটি—বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষের আগ্রহাতিশয্যে রচনা করি। রচনা দুইটি যথাক্রমে 'প্রবন্ধ' পত্রিকায় এবং 'বিংশ শতাব্দী'তে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক শ্রীঘোষেরই উদ্যোগে। এই সুযোগে আমি তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এ গ্রন্থে অল্পপরিসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার স্বরূপসন্ধানের প্রয়াস আছে। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী', ও 'তপতী'—এই চারখানি নাটক যে বিশেষভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ম এবং কল্পনা-কবিত্বের পরিচয়বাহী, তাহা আমি এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থখানি রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

স্কটিশ চার্চ কলেজ
কলিকাতা

—গ্রন্থকার

॥ গ্রন্থকারের অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(চর্যাপদ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত)

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-নাটক

কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন
(পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

ভাবময়তায়। প্রত্যেকটি নাটকে শুনা যায় একটা প্রশান্ত স্থির অথচ সুতীব্র অনুভূতির সুর। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি তাঁহার কবিতার মতই অনুভূতির প্রসাদ।

নাটকে থাকে ঘটনার ঘনঘটা। শ্লেগেল (Schlegel) বলিয়াছেন—

Action is the true enjoyment of life, nay, life itself.[১]

নাটক জীবনের প্রতিবিম্ব—গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। এলিজাবেথ ড্রু'র ভাষায়—

Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre.[২]

Cicero-ও বলিয়াছেন, নাটক জীবনভিত্তিক—

Drama is a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth.

কিন্তু সাধারণ নাটকে ও রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে একটা মৌলিক প্রভেদ লক্ষণীয়। আমরা বলিয়াছি, নাটকে থাকে জীবনের ঘটনা, নাটক হইতেছে সংঘাতময় মানবজীবন। নাট্যকার তাঁহার নাটকে জীবনের ঘটনা-সংঘাতকেই রূপদান করিয়া থাকেন। অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার আবর্তে পড়িয়া মানুষের জীবনপ্রবাহ যে পরিণতিতে পৌঁছায়, তাহাকেই দেখানো হয় নাটকে। নাটক দ্বন্দ্বসংঘাতময় মানবজীবনের প্রতিবিম্ব।

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে কিন্তু স্বতন্ত্র কথা। তিনি ঘটনা-সংঘাতময় জীবনকে ফুটাইয়া তোলার দিকে ততটা দৃষ্টি দেন নাই—একটা ভাবতত্ত্বকে পরিস্ফুট করার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

১। Schlegel—Dramatic Literature.

২। Elizabeth Drew—Discovering Drama.

নাটকের প্রয়োজনে একটা ঘটনাপ্রবাহ তাঁহার নাটকে থাকে বটে, কিন্তু তাঁহার নাটকে ঘটনা অন্তরালে পড়িয়া যায়, স্ফুট হইয়া উঠে তত্ত্ব। স্থূল কতকগুলা ঘটনার সমাবেশ না ঘটাইয়া, যাহা সূক্ষ্ম, তাহাকেই তিনি ফুটাইয়া তোলেন। অন্তরের গভীরতর রহস্যকে তিনি দেখাইয়া দেন। মনের রহস্যবিশ্লেষণে তিনি বেশী মনোযোগী। ভাবের রূপকার হিসাবেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার নাটক ভাবতত্ত্বের আধার। তাই কবির নাটক সম্পর্কে Dr. E. J. Thompson মন্তব্য করিয়াছিলেন—

His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expressions of action.[১]

টমসন সাহেবের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের নাটকের-সত্য-স্বরূপেরই নির্দেশক। তাঁহার নাট্যপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি 'আইডিয়া'—একটি অনুভূত সত্যকে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া একটা সত্যকে, আদর্শকে শিল্পরূপ দান করা হইয়াছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। তাই তাঁহার উপন্যাস ছোটগল্প নাটক কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। যে সাহিত্যে কল্পনা লইয়াই বেসাতি, মনের লীলা যেখানে সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া আছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও সৃষ্টি অপরূপ বিচিত্রতায় ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে।

লিরিক কাব্যে যেখানে বস্তুর বালাই নাই, কেবল ভাবের লীলা-সঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ সেখানে অতুল। এইজন্য ছোটগল্পে, যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার মর্মনিহিত সুরটুকুই রচনার উপকরণ, রবীন্দ্রনাথ সেখানে অতুলনীয়। উপন্যাসেও তিনি সেইখানেই সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, যেখানে মানবচিত্তের

১। E. J. Thompson—Tagore : Poet and Dramatist.

অতি সূক্ষ্ম সুকঠিন ভাবরহস্যকে তাঁহার রূপদান করিতে হইয়াছে। Fact-এর ভিতর তাঁহার কবিধর্মের ততটা বিকাশ হয় নাই, যতটা হইয়াছে abstraction-এর ভিতর। শিলাময় বাস্তব জীবনকে তিনি তাঁহার নাটকে পরিস্ফুট করিতে চাহেন নাই।

আর একজন সুধী সমালোচক বলিয়াছেন—

"They are not dramas of circumstances. It is the permeating idea in them that matters, in such European plays of this type as Gerhart Hauptmann's 'Hannelles Himmelfahrt', August Strindberg's 'Dream Play', Maurice Maeterlinck's 'Blue Bird' and Ibsen's 'When We Dead Awaken.'"[১]

তাঁহার ছোটগল্পে যেমন—'নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা' —তাঁহার নাটকেও তাই। সেখানে ঘটনা অতিশয় ক্ষীণ, ঘটনাকে ছাপাইয়া একটি ভাবব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি। এই যে ভাবব্যঞ্জনা, ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যেরই একটি প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই কাব্যলক্ষণ সুস্পষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের নাটককে কাব্যধর্মী বলিতে হয়—এমন কি, কোথাও কোথাও লিরিকধর্মীও বটে। ভাবের ব্যঞ্জনাই তাঁহার নাটকগুলিকে মহিমা ও শ্রী দিয়াছে। তাঁহার নাটকে ঘটনার বিরলতা আছে। কিন্তু তিনি তাহাকে এমনই কবিত্বসম্পদে পূরণ করিয়াছেন যে উহা কোনরূপ অতৃপ্তি আনে না। তিনি ঘটনার কাঠামোয় কাব্যের রং ধরাইয়াছেন, কাহিনীর প্রতিমায় কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে যে চিরন্তন কবিটি ছিল, সে কখনও বস্তুশিল্পীর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে নাই। বাস্তবতার কাব্যানুরঞ্জনেই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। Fact অপেক্ষা abstraction, real অপেক্ষা ideal

১। The Bengali Drama—Dr. P. Guha Thakurata.

তাঁহাকে আকর্ষণ করিত বেশী। তাই বীণাখানি ফেলিয়া রাখিয়া নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ রচনা করা সত্ত্বেও ঐ সকল সৃষ্টিতে গীতিকবিতার বীণাধ্বনিই ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

একটি তত্ত্বকে রূপদান করার জন্য—পরিস্ফুট করার ইচ্ছায় তিনি একটি কাহিনী কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কাহিনীর প্রবাহ এমনই যে সেই প্রবাহস্রোতে কবির উপলব্ধ তত্ত্বটিই স্ফুটতর হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন—"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া সঙ্গীতের উত্তেজনায় রচিত হইয়াছিল।" এই যেমন সঙ্গীতের উত্তেজনা হইতে দুখানি নাটক, ঠিক তেমনই ভাবকে রূপকে রহস্যে ইঙ্গিত-ময়তায় প্রকাশ করার জন্য তাঁহার পরবর্তীকালের সকল নাটক। অনঙ্গ ভাবকে অঙ্গ দিবার উদ্দেশ্যে—অরূপ ভাবকে রূপ দিবার জন্য তাঁহার নাটক—সাঙ্কেতিক নাটকগুলি ত' বটেই। রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মালিনী, তপতী প্রভৃতি নাটকও তাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ'—এই ভাবতত্ত্ব। শারদোৎসব নাটকে প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যোগের কথা; অচলায়তনে জড় নিয়ম বা প্রথাবদ্ধ জীবনের সঙ্গে—মন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বে প্রাণের জয়ঘোষণা। ডাকঘরে সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব—'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা'—এই ভাবটি। ফাল্গুনী নাটক স্থিরতাকে, নিষ্প্রাণতাকে, জরা ও জড়তাকে ধিক্কার দিয়া আরম্ভ। গতির প্রশস্তি নাটকখানির মধ্যে আগাগোড়া। মুক্তধারায় যন্ত্রশক্তি ও প্রাণশক্তির দ্বন্দ্ব—সে দ্বন্দ্বে প্রাণের জয়। রক্তকরবী নাটকে যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহাও প্রাণের সহিত যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। রাজা ও রাণী নাটকে ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্ব। একদেশদর্শী কর্তব্য-

বিরহিত, কল্যাণের সহিত সম্পর্করহিত প্রেমের ব্যর্থতা ঐ নাটকে প্রদর্শিত। বিসর্জন নাটকে বেশ কিছু ঘটনার সন্নিবেশ আছে। কিন্তু সেখানেও কাহিনীর চেয়ে তত্ত্বই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে যে সংঘাতময় জীবনচ্ছবি আছে, তাহা মানুষে মানুষে সংঘাত নহে। আদর্শের সহিত আদর্শের দ্বন্দ্বই এই নাটকখানিতে প্রকট। রঘুপতি পাথরের মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। দেবী-পূজার চিরায়ত সংস্কারকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। সংস্কারের পাষাণকারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার শক্তিদম্ভ ও প্রতাপ হৃদয়ধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছে। অন্যদিকে অপর্ণার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মন্দিরে এক নূতন সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। জয়সিংহ তাহা বুঝিয়া বলিয়াছে—

> তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সঙ্গীত
> ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
> করুণাকাতর কণ্ঠে।

প্রেমের আঘাতে অন্ধ ভক্তি সংশয়াকুল হইয়াছে। নাটকের প্রথম হইতেই দুটি বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব, দুই বিরোধী আদর্শের সংঘাত; প্রথম দৃশ্য হইতেই যুদ্ধের উদ্‌যোগপর্ব।

বিসর্জন নাটকে পাই, রঘুপতির নিষ্ঠুর শক্তি রাণীকে সমগ্রভাবে ও জয়সিংহকে আংশিকভাবে অধিকার করিয়াছে। অপর্ণার দেবী-শক্তি—তাহার প্রেম ও কারুণ্যশক্তি রাজাকে পুরাপুরি এবং জয়সিংহকে আংশিকভাবে অধিকার করিয়াছে। দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছে—প্রথাসংস্কারের সঙ্গে প্রেমের। নাটকে আদর্শের প্রতি-ফলনই মুখ্য হইয়াছে।

বিসর্জন নাটকে প্রেম ও প্রথার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া সে দ্বন্দ্বে প্রেমের জয় দেখানো হইয়াছে। রক্তকরবী নাটকেও প্রেমের

জয়ঘোষণা—প্রেম ও যন্ত্রের দ্বন্দ্বে, প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন। প্রেমের সর্বজয়ী ক্ষমতা দেখানোর জন্য বিসর্জন এবং রক্তকরবী নাটক রচিত।

বিসর্জন নাটকে যে জীবন আঁকা হইয়াছে তাহা বাস্তব জীবন নয়, ভাবজীবন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনা বা আনন্দের প্রকাশ তাঁহার নাটকে নাই। কবির কোন নাটকেই কতকগুলি স্থূল মানুষের রাগদ্বেষ প্রণয়াদির কথা বা হাসিকান্নার কৃত্রিম উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। মানুষের অনুভূতিময় জীবনকে প্রকাশ করাই ছিল কবির লক্ষ্য। নাটক রচনার জন্য ঘটনার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিস্মৃত হন নাই। তবে ঘটনার ভিত্তির উপর মনের লীলাকেই ফুটাইয়াছেন।

মালিনী নাটকে মৈত্রী প্রীতি ও করুণার জয়গাথা। তাসের দেশে বদ্ধজীবনের ব্যর্থতা স্পষ্টীকৃত—'বন্ধনমুক্তির আনন্দ ব্যঞ্জিত'।

কবির নাটকের নায়কনায়িকারাও ভাবতত্ত্বের আধার—Idea personified। এখানে এক এক করিয়া তাঁহার বিভিন্ন নাটকের কয়েকটি চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীতে ত্যাগের আত্যন্তিকতা, বৈরাগ্যের ব্যর্থতা। নাটকের সন্ন্যাসী তাহার প্রথম জীবনে জীবনের সাধনা না করিয়া বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াছে। জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। সে বৈরাগ্যের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছে। নাটকের রঘুদুহিতা বালিকা মোহাবিষ্ট ঐ সন্ন্যাসীর মোহমুক্তি ঘটাইয়াছে। সে বিসর্জন নাটকের অপর্ণার মত ক্ষুদ্র বালিকা—কিন্তু তাহার শক্তি অসীম। প্রেমের শক্তিতে সে সন্ন্যাসীর মোহমুক্তির সহায়িকা হইয়াছে।

রাজা ও রাণীর বিক্রমদেবের মধ্যে অন্ধ প্রেম—একটা মোহাবিষ্ট

ভাব। সুমিত্রায় কল্যাণপূত প্রেম—সে প্রেম তত্ত্বসর্বস্বতায় উর্ধ্ববাহু নয়। এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে, ধূলিসমাকীর্ণ পথের সঙ্গে সে প্রেমের বন্ধনহীন গ্রন্থি। বিসর্জনের রঘুপতি প্রথা ও প্রতাপ। গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণার মধ্যে প্রেমের সর্বজয়ী শক্তি। শারদোৎসব নাটকের চরিত্রগুলি Idea personified। উপনন্দ দুঃখের সাধনার ভিতর দিয়া মহত্তর জীবনের অধিকারী হওয়ার সাধনা করিয়াছে। দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া সে আপন দীপ্তশ্রী ফুটাইয়াছে। ঠাকুরদাদা ও রাজা আনন্দের বিগ্রহ, গতির প্রতিভূ। অন্যদিকে লক্ষেশ্বর ও রাজা সোমপাল বস্তুবাদী। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও কৃপণতায় আচ্ছন্ন। তাহাদের চিত্তে ক্ষুদ্র ঈর্ষার একাধিপত্য। তাই তাহারা আনন্দের অধিকার হইতে বঞ্চিত। নাটকে একদিকে ছেলের দল, তাহারই অন্যদিকে লক্ষেশ্বর। একদিকে ছুটির খুশি, 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ে' জীবনটাকে ভরিয়া তুলিবার সাধনা। তাহারই উল্টাদিকে সঞ্চয়বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র ঈর্ষা। যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য, তাহারা আনন্দে ও গানে নিজেদের বিলাইয়া দিবার জন্য দুর্বার, চঞ্চল। কিন্তু লক্ষেশ্বর শুধুই লাভক্ষতি গণনা করিয়াছে—দানে তাহার কৃপণতা। তাহার জীবনের গতিপ্রবাহ রুদ্ধ।

শারদোৎসবের পরবর্তী সংস্করণ 'ঋণশোধে'র মধ্যেও একটি ভাবতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে তত্ত্বটি হইতেছে—ত্যাগের ভিতর দিয়া নূতন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠার তত্ত্ব, দুঃখের সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দের অধিকারী হওয়ার তত্ত্ব।

রাজা নাটকে রূপসাধনা ও অরূপসাধনার দ্বন্দ্ব—রূপের সাধনা হইতে অরূপসাধনায় উত্তরণ নাটকখানির মূলতত্ত্ব। রাণী সুদর্শনায় রূপতৃষ্ণা, তিনি তাঁহার মন বিকাইয়াছিলেন ইন্দ্রিয়ের কাছে।

রাজাকে খুঁজিয়াছিলেন বাহিরের জগতে। আগে অন্তরে অনুভবের মধ্যে পরমসুন্দরের স্বরূপ বুঝিয়া, তারপর বাহিরের জগতে ভগবানকে খুঁজিলে তাঁহাকে পুরাপুরি পাওয়া যায়—এই পরম তত্ত্বটি সুদর্শনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

নাটকের রাজা ভগবানের প্রতীক। তাঁহাকে একদিকে করা হইয়াছে কোমল, অন্যদিকে তিনি কঠোর। তিনি রূপময়, আবার অরূপ। মানুষ তাঁহাকে চিনিতে ভুল করিলে দুঃখের আঘাতে আঘাতে তিনি চিনাইয়া দেন আপনাকে। ইহাই ঘটিয়াছে সুদর্শনার জীবনে। দুঃখের ভিতর দিয়া তিনি কান্তকে পাইয়াছেন। অন্ধকার ঘরে আপন অভিজ্ঞতার ভিতরে সুদর্শনা রাজাকে পাইবার সাধনা করেন নাই। শাস্ত্রের রাজপথ ধরিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই রাজার মন্দিরে তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই।

এই সুদর্শনার বিপরীত কোটিতে পাই সুরঙ্গমাকে। পাই ঠাকুর্দাকে। ইহারা বুঝিয়াছেন—ভগবান নাম-রূপের অতীত। অন্ধকারের সাধনায়—অরূপসাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাই ভগবৎসাধনায় তাঁহাদের ভুল হয় নাই।

ডাকঘরের অমল বন্দী মানবাত্মা। তাহার মধ্যে মানবাত্মার বন্ধন-বেদনা—দূরের যাত্রায় নিষ্ক্রমণের আকুতি—yearning of the soul for the infinite! অমলের সম্পর্কে সমালোচনায় সুধী সমালোচকেরা বলিয়াছেন—

১। Amal personifies man's longing for free and natural development. This longing is fettered by external trivialities, suppressed by those around us, who do not understand, or are not favourably inclined towards it *

---

* Prof. V. Lesny,

২। Amal is not so much a person of flesh and blood as a personification of the poet's own subjective experience. It is, as it were, a part of universal life-force, and it functions not in the grosser world of matter but in the realm of spirit.*

ডাকঘর নাটকের মাধব দত্ত বস্তুবাদী, শাস্ত্রের রাজপথের পথিক। তাই সে প্রথার বন্ধনে, লৌকিক আচারের বন্ধনে অমলের মুক্ত আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে পাকে পাকে বাঁধিতে চাহিয়াছে, বাহিরের সকল সৌন্দর্যের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ঠাকুর্দা মুক্ত পুরুষ, সদানন্দ, সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন। অমলের স্বপ্নকল্পনাকে জাগ্রত করার তিনি সহায়ক। রাজ-কবিরাজও এমনি একটি ভাবময় চরিত্র—মুক্তির অগ্রদূত। ইঁহারা শুধু চোখ দিয়া দেখেন নাই। চোখের দেখার সঙ্গে মনের দেখাটাকে যোগ করিয়াছেন, তাহার সহিত আবার অধ্যাত্ম-দৃষ্টিকে যোগ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের দৃষ্টিক্ষেত্র সীমাহীন।

অচলায়তনের মহাপঞ্চক কঠোর নিষ্ঠার প্রতীক, পঞ্চক প্রাণ-শক্তির প্রতীক। সুভদ্র নিপীড়িত বন্দী মানবাত্মা—অনেকটা ডাক-ঘরের অমলের মত। গুরু রসিক অথচ বৈরাগী, আত্মভোলা, চির-নবীন। তিনি সদানন্দময়, নির্ভীক, সত্যের পূজারী। অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু। মোহের প্রাচীর ভাঙার জন্য নাটকে তাঁহার আবির্ভাব। বৃথা আচার ও মননহীন মন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান। এই গুরু জড়তাকে আঘাত করিয়াছেন, বাধাকে ভাঙিয়াছেন, সযত্নরক্ষিত জঞ্জালকে অপসারিত করিয়াছেন। ভাঙা ও গড়া তাঁহার কাজ। দৃষ্টিকে উদার করা, প্রসারিত করিয়া দেওয়া গুরুর

*Dr. P. Guha Thakurata.

জীবনের সাধনা। অচলায়তন নাটকে প্রাণ ও মন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে প্রাণের জয় প্রদর্শিত।

✓ ফাল্গুনী নাটকে অকারণ অবারণ চলার গান, গতির প্রশস্তি বা • জয়গাথা। নাটকে একদিকে আছে যৌবন, অপরদিকে জড়তা। যৌবন ও জড়তার দ্বন্দ্বে যৌবনের জয়। নাটকের ছেলের দল প্রাণের প্রতীক, সজীবতায় উচ্ছল। অন্ধ বাউলও অপর্যাপ্ত প্রাণের অধিকারী। তাহার কান মন্ত্রগুঞ্জনে ভারাক্রান্ত নয়। তাহার অন্তরে অনুভূতির আলো, সেই আলোয় সে যাহা দেখে, তাহা চোখের দৃষ্টির অগোচর। নাটকের সর্দার চিরনবীন—'বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম'। নাটকে তাহার কাজ সবাইকে চালনা করা—পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়।

ইহারই বিপরীতে দাদা আর শ্রুতিভূষণ। ইঁহারা বৈরাগ্য-বারিধির তলায় নিমজ্জিত, প্রাণোচ্ছলতা ও আনন্দচাঞ্চল্যে অবিশ্বাসী।

✓ মুক্তধারার অভিজিৎ ভাবময় চরিত্র। যন্ত্রসভ্যতার স্ফীতিতে মানুষের অন্তরাত্মা পীড়িত হয়—অভিজিৎ সেই পীড়িত মানবাত্মার প্রতীক। তাহার মধ্যে সুন্দরের স্বপ্ন, প্রেমচেতনার মহত্ত্বে সে উদ্বুদ্ধ। তাই ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতাকে সে তাহার জীবনে আমল দেয় নাই। ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না। প্রেম তাহাকে করিয়াছে নির্ভীক, প্রেমের অনুরোধে সে সত্যাগ্রহী। দাসত্বের কলঙ্কতিলক সে তাহার ললাটে আঁকিতে চাহে নাই। এই অভিজিৎ গতিবেগে শিহরিত, মুক্তধারা ঝরনার মত তাহার মধ্যে দুরন্ত গতি। ঝরনার পাশে তাহার জন্ম হইয়াছিল। তাই ঝরনার মতই সে দুর্বার, বন্ধন-বিমুখ। ঝরনার মতই সে অনন্তসন্ধানী, অমৃতপিপাসায় চঞ্চল।

মুক্তধারার ধনঞ্জয় নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তিনি অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ করিয়াছেন। তিনি রাজদ্বারে নির্ভীক, দরিদ্র মূক প্রজার মুখপাত্র বন্ধু, জনসাধারণের বিপদে সাহস ও সহায়, আনন্দময় সত্যের পূজারী, নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও সর্বংসহ। দুঃখের সাধনায় ধনঞ্জয়ের জীবন উৎসর্গীকৃত। অনাসক্তি ও গতি এ চরিত্রের সমস্ত শক্তির মূলে।

চরিত্রটির মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন শক্তিসম্পদ যেন মূর্ত। ভারতবর্ষ বলিলেই আমরা বুঝি নিস্তব্ধতার ভীষণ শক্তি, দারিদ্র্যের কঠিন বল, মৌনের স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার কঠোর শান্তি, বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্য। ধনঞ্জয়ে উহারই প্রকাশ। তিনি আত্মসমাহিত, তাঁহার মধ্যে স্তব্ধতার আধারভূত কাঠিন্য। তাঁহাতে ভারতবর্ষের মহাতাপসের রূপ। তাঁহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি দীপ্তি পাইয়াছে।

মুক্তধারা নাটকের যন্ত্ররাজ বিভূতি যন্ত্রশক্তির প্রতিভূ, শক্তিমদমত্ততার প্রতীক।

রক্তকরবীর রাজায় প্রতাপ—যান্ত্রিকতা ও ধনতন্ত্রের শক্তির তিনি আধার। তিনি যন্ত্রস্বভাব ও মানবস্বভাবের দ্বৈত উপাদানে গড়া। সর্দার ধনতন্ত্র ও যান্ত্রিকতার exploitation-এর মূর্তি। নন্দিনী জীবন—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে 'লক্ষ্মী সে কল্যাণী'। সে আনন্দলহরীর concrete রূপ। তাই নাটকে সকলকে সে চঞ্চল করিয়াছে, সকলের মধ্যে গতির আনন্দাবেগ জাগাইয়াছে, সকলের সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করিয়াছে। বিসর্জনের অপর্ণার মতই তাহার শক্তি অপরিমেয়। বিসর্জনের অপর্ণার মতই বদ্ধতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য সে জোরের

সঙ্গে আহ্বান করিয়াছে রাজাকে। রঞ্জনে আনন্দ, আবেগ ও গতি। তাহার ভিতর ছন্দের সমাবেশ, সে পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতীক। তাহার মধ্যে—

জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি—

এই ভাব। নন্দিনী ও রঞ্জন যেমন মুক্তির সাধক, বিশুও তেমনি। কঠোর দুঃখবরণের ভিতর দিয়া, তপস্যার ভিতর দিয়া সে মুক্তির অঙ্গনতলে দাঁড়াইবার সাধনা করিয়াছে—সে সাধনায় বিশু সিদ্ধিলাভও করিয়াছে। সে উদাসী অনাসক্ত—এইজন্য গতিধর্মে সে উদ্বুদ্ধ।

রথের রশি নাটকের কবি ভাবময় চরিত্র। পৃথিবীতে ছন্দের মিল, সুরের সঙ্গতি রাখার জন্য আবির্ভাব হইয়াছে কবির। মানুষকে জড়তার জাল হইতে মুক্ত করিয়া একটা মহত্তর উদারতর ভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিবার জন্য কবিরা যে আবির্ভূত হন, সে ইঙ্গিত এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়া দেখানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকে একদিকে নিয়মশৃঙ্খলা, প্রথাবদ্ধতা। তাহারই মধ্যে আবির্ভাব হইয়াছে রাজপুত্রের ও সদাগরপুত্রের। ইহারা চঞ্চল, যৌবনের দূত। ইহাদের আগমনে তাসের দেশ—যেটা ছিল নিয়মের রাজ্য, সেই রাজ্যে সূচিত হইয়াছে অনিয়ম, বাঁধা কাজের ভিতর আসিয়াছে আনন্দরোমাঞ্চ। বৈচিত্র্যহীন জীবনে আসিয়াছে ছন্দ।

নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ দ্বন্দ্ব—ঘটনার দ্বন্দ্ব, চরিত্রের দ্বন্দ্ব। নাটক নিষ্প্রদীপ আলোক-উত্তাপবিহীন সৃষ্টি নয়। নাটকের ঘটনা ও চরিত্র সমস্তই দ্বন্দ্বসংঘাতে উজ্জ্বল।

The cardinal part of a drama is conflict. Every dramatic story arises out of some sort of conflict, some clash of opposed individuals, or passions, or interests. With the opening of this conflict the real drama begins; with its conclusion the real plot ends.

নাটকের এই দ্বন্দ্বসংঘাত নানা ভাবের হয়—

Conflict of feelings, modes of thought, desires, wills, purposes; conflict of persons with one another or with circumstances.

নাটকে কেবল বহির্ঘটনার দ্বন্দ্ব নয়, প্রবৃত্তি বা আদর্শের দ্বন্দ্বও থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে এই প্রবৃত্তি বা আদর্শের দ্বন্দ্বকেই মুখ্য করিয়াছেন। তাঁহার নাটকে ভাবের দ্বন্দ্ব। সময়ে সময়ে সে দ্বন্দ্ব অতিশয় সূক্ষ্ম।

নির্ঝর ও নদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ছিল খুব বেশী। তাই বদ্ধজীবন হইতে নিষ্ক্রমণের আকূতি তাঁহার অনেক নাটকেরই বিষয়বস্তু হইয়াছে। ছোট গণ্ডির মধ্য হইতে বড় গণ্ডির মধ্যে জীবনটাকে ব্যাপ্ত দেখার সাধ তাঁহার বারেবারেই হইয়াছে। সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে চিরদিন পীড়িত করিয়াছে—বদ্ধ জীবনের দুর্বিষহতায় তিনি মুহ্যমান হইয়াছেন, বিদ্রোহ করিয়াছেন সেইরূপ সঙ্কীর্ণ জীবনের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই পথিক। তাই প্রেয় হইতে গিয়াছেন শ্রেয়ের দিকে, ব্যক্তি হইতে বিশ্বের দিকে, বন্ধন হইতে মুক্তির অভিমুখে।

নির্ঝর অন্ধকার গিরিগুহায় বদ্ধ ছিল, দূর সমুদ্রের আহ্বানে সে যেমন অনন্ত-অভিমুখ হইয়াছিল—অসীমের দিকে নিজেকে

প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের মনও সর্ব সময় তাহাই চাহিয়াছে। প্রভাত-সঙ্গীতে এই ভাব। মানসী কাব্যে—

> ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার—
> শীর্ণ বাহু আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
> করিছে আমারে হায় অস্থিচর্মসার।

তাঁহার পরবর্তী-কালের প্রায় সকল কাব্যেই এই ভাবেরই অভিব্যক্তি। তাঁহার নাটকেও পাইয়াছি বন্ধনের বেদনা, মুক্তির উল্লাস। রাজা ও রাণী নাটকে বাসনাময় আত্মকেন্দ্রিকতা তিরস্কৃত হইয়াছে। বিসর্জন নাটকে অহং-এর উগ্রতা সংকীর্ণতার উপর প্রেমের জয়। স্বার্থময় বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া একটা উদারতর প্রশস্ততর ভূমিতে বিচরণের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথে বরাবরই অতিশয় তীব্র ছিল। সেই ভাবটি তাঁহার অনেক নাটকে।

প্রকৃতির প্রতিশোধে বদ্ধ জীবন হইতে মুক্তির আনন্দ ব্যক্ত। অচলায়তন, ফাল্গুনী, রক্তকরবী, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটকেও সেই একই ভাব। বিসর্জন নাটকে পাইয়াছি—স্থিতির রাজ্য। সে রাজ্য সংস্কারে স্থিতিশীল। সেখানে শিকলদেবীর পূজাবেদী—সেখানে তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ সরিত না। সেখানকার গতি গিয়াছিল স্তব্ধ হইয়া। অপর্ণার আগমনে জড়তার এই রাজ্যে আসিয়াছিল আবেগ, আসিয়াছিল মহত্তর উদারতর জীবনের জন্য উৎকণ্ঠা। একটু তলাইয়া দেখিলে ধরা পড়ে যে, কবির অচলায়তনের পটভূমি আর বিসর্জনের পটভূমি প্রায় একরূপ। অচলায়তনের রাজ্যটি পাথরের প্রাচীরবেষ্টিত—সে প্রাচীর অসত্যের প্রতীক, উহাই 'শিকলদেবীর পূজাবেদী।' উহা ছিল প্রাণ ও গানের বিকাশে বাধা। উহা পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বেষ্টনী। অচলায়তনের রাজ্যটি—স্থিরতা ও স্তব্ধতার রাজ্য। সে রাজ্যে আচার প্রথার পীড়নে কেবলই কান্নার ধ্বনি

উঠিয়াছে। উহা নিয়মের রাজ্য, অহোরাত্র কেবল নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। সেখানে—

পাথরের প্রাচীর, বদ্ধ দরজা, নানা রেখার গণ্ডি, স্তূপাকার পুঁথি। অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি।

এখানকার অধিবাসীরা শাস্ত্রের বিধিনিষেধে আবদ্ধ। ইহাদের—

চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঘুমায় যেন চিত্রপটে আঁকা।

ইহাদের পা আড়ষ্ট, চলিবার শক্তি নাই। এ রাজ্যে সবই প্রাচীন। নূতন সেখানে আমল পায় না। রাজ্যটি সংস্কারে স্তব্ধগতি—জড়তাগ্রস্ত। ইহাদের উন্নতি-পরিণতি সব থামিয়া গিয়াছে—নূতন পথে গতির সাধনায় ইহারা অসমর্থ, ইহারা কুসংস্কারের জালে বদ্ধ। ইহারই মধ্যে প্রাণের প্রতিমূর্তি পঞ্চক। সে শৃঙ্খলার মধ্যে অনিয়মের সূচনা করিতে চাহিয়াছে। সংস্কারের বন্ধন খসাইয়া দিবার সাধনা করিয়াছে। তাহার ভূমিকা অনেকটা বিসর্জন নাটকের অপর্ণার মত।

রক্তকরবী নাটকে একদিকে সোনার রাশি, অন্যদিকে নন্দিনী। একদিকে খনি খোদাইয়ের প্রথাবদ্ধ কাজ, অন্যদিকে নন্দিনীর কণ্ঠে সেই প্রথাবদ্ধতা হইতে বাহির হইয়া আসার আহ্বান। নন্দিনীর আবির্ভাব রক্তকরবী নাটকের নিষ্প্রাণতা ও যান্ত্রিকতার মধ্যে আনিয়াছে নূতন প্রাণের স্পন্দন, আনিয়াছে সজীবতার স্পর্শ। এই নন্দিনী যেন কালবৈশাখীর মেঘ। কালবৈশাখীর মেঘের মত পুরানো গাছের জীর্ণ পাতা ঝরাইয়া, চারিদিকে সজীবতার স্পন্দন জাগাইবার জন্য সে আসিয়াছিল যক্ষপুরীতে। অপর্ণার ভূমিকার সঙ্গে নন্দিনীর এই ভূমিকার বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে। অর্থহীন সংস্কার ও প্রথাবদ্ধতার সুদৃঢ় মূলটিকে উৎপাটন করিতে দরকার হয়

কালবৈশাখীর প্রচণ্ড শক্তি। অপর্ণার মধ্যে ও নন্দিনীর মধ্যে সেই দুর্জয় শক্তি।

রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি নাটকের আলোচনা এ গ্রন্থে করা হইয়াছে, তাহার সব কয়টিই Tragedy। ট্র্যাজেডী জীবনের গোপনতলশায়ী বেদনার আলেখ্য। ইহা বিফলীকৃত মানবের হৃদয়জ্বালার অগ্নিপত্র। ট্র্যাজেডী নাটকে নায়কের জীবনের নিদারুণ বেদনা ও বিপর্যয় রূপ পায় এবং সেই বৈফল্যে সুমহৎ সম্ভাবনার বিনষ্টি—ইহাই হইল ট্র্যাজেডীর ফলশ্রুতি। বস্তু বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া কি করিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে, ঘটনার সংঘাত কিভাবে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিতেছে, তাহাকেই চিত্রিত করিয়াছে ট্র্যাজেডী। মানুষের জীবন সরল রেখার মত দিক পরিবর্তন না করিয়া অগ্রসর হয় না। বিচিত্র ঘটনা, বিভিন্ন বিপর্যয়, বিশেষ বিশেষ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার প্রভাবে ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করিতে করিতে মানবজীবন আবর্তিত হইতে থাকে। হয়ত বিপর্যয়ের চূড়ান্ত আঘাত জয় করিবার আগেই অত্যন্ত করুণভাবে জীবনের অবসান ঘটে। নতুবা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া সে লাভ করে সাফল্যের শুভাশিস, বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য। ইহাই মানবজীবন-নিয়তি।

দ্বন্দ্ব ট্র্যাজেডীর রসস্তম্ভ। ট্র্যাজেডীর দ্বন্দ্ব দুই উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে। এক ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রসারিত হইয়া একের মধ্য হইতে বহুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। অন্যটি গভীরতর হইতে হইতে হৃদয়কে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। অর্থাৎ, একদিকে অনেক হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে ট্র্যাজেডী হইতে পারে, অন্যদিকে একই চিত্তের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তির নিরন্তর সংঘাতেও ট্র্যাজেডী হইতে পারে।

ট্র্যাজিক চরিত্র সংঘর্ষের আগুনে উজ্জ্বল। হয় বাহিরের কোনও

দুর্ধর্ষ শক্তির সহিত সংঘর্ষ, নয় ভিতরের দ্বন্দ্ব। গ্রীক ট্র্যাজেডীতে অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে বহির্দ্বন্দ্বের প্রাধান্য। সেখানে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির কাছে মানবশক্তির পরাজয়। পরাজয়ের বীজটি নিয়তিনিহিত।

গ্রীক ট্র্যাজেডীর পরিণাম—pity ও fear। এরিস্টটল ট্র্যাজেডীর দর্শনে আবেগমুক্তির কথা বলিয়াছেন। দর্শকচিত্তের করুণা ও ভয়কে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া ট্র্যাজেডীর কাজ। ইহাই মহৎ ও বৃহতের দিকে ইঙ্গিত দেয়। তখন অসৎ হইতে চিত্ত সৎ-এ পৌঁছায়, অনাচার হইতে আদর্শে, অনিয়ম হইতে নিয়ম-শৃঙ্খলায়।

সেক্সপীয়ারের নাটকে পরাজয়ের বীজ চরিত্রের গভীরে। তাঁহার নাটকের ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি—যথা হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লীয়র প্রভৃতি বিশাল সম্ভাবনাদীপ্ত। কিন্তু তাহাদের পরাজয় দেখাইয়া তিনি পাঠকমনে সৃষ্টি করিয়াছেন শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় এবং সহানুভূতি-মিশ্রিত বিস্ময়।

তবে উভয়বিধ ট্র্যাজেডীর ফলশ্রুতি এক। ট্র্যাজেডীতে এক-দিকে থাকে হারানো, আর একদিকে থাকে পাওয়া—থাকে মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা। থাকে আত্ম-দর্শনের গভীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। ট্র্যাজিক চরিত্রের বিষাদময় পরিণতির ভিতর দিয়া চিনিতে পারা যায় সত্যকে। ট্র্যাজেডীতে প্রতিষ্ঠা পায় বিশ্বসত্য—যাহার ভিতর দিয়া মানুষ পায় জীবন গঠন করার আদর্শ। ট্র্যাজেডীর শেষে সকল অশান্তির অবসান—শান্তি নামিয়া আসে অলক্ষ্যগোচর হইয়া বা লক্ষ্যগোচর রূপেই। ট্র্যাজেডীতে ব্যর্থতার সোপান বাহিয়া আসে পূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডী নাটকের বিশেষত্ব চোখে না পড়িয়া যায় না। তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটকগুলিতে নিষ্ফলতার হাহাকারধ্বনি

নাই। পরাভূত প্রাণের কান্নার ভিতর দিয়াও একটা প্রাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটকের শেষে মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যুর ভয়াবহতা তাঁহার নাটকের শেষ কথা নয়। ট্র্যাজেডীর পরিণামে অন্যায় অসত্য ধ্বংস হইয়াছে। প্রাণের মূল্যে, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মূল্যে সত্যলাভ হইয়াছে। অন্যায় ও অধর্মকে উৎসাদিত করিতে প্রাণ দিতে হইয়াছে—ইহা তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে পাপমোচন হইয়াছে। মহৎ ও বৃহতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়া তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটকের উপসংহার হইয়াছে।

অনুশোচনার অশ্রুজলে তাঁহার ট্র্যাজেডীর নায়কেরা সিক্ত হইয়াছে। সেই অনুশোচনায় ট্র্যাজেডীর নায়ক সত্যের আলোক-রশ্মি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে—বৃহত্তর মহত্তর জীবনে নায়কের উত্তরণ পাওয়া গিয়াছে। রাজা ও রাণী এবং তপতী নাটকে বিক্রমদেব রাণী সুমিত্রাকে হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সর্বস্বধনের বিনিময়ে বিক্রমদেব অমৃতের স্বাদ পাইয়াছেন—তাঁহার মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুতে ট্র্যাজেডী নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু জয়সিংহের সেই মৃত্যু ক্ষতির খাতার একটা অঙ্কমাত্র নয়। উহা রঘুপতির মধ্যে সত্যধর্মের বোধ জাগাইয়া দিয়াছে। দীর্ঘকাল রাজ্যমধ্যে যে পাপ, অন্ধ-সংস্কার অথবা হিংসা-দ্বেষ বিরাজিত ছিল, তাহা জয়সিংহের আত্মাহুতির পরে নিমেষে মুছিয়া গিয়াছে। বিসর্জন নাটকের শেষ পরিণতিতে রিক্ততার বেদনাটা সর্বস্ব হয় নাই, রঘুপতি নাটকের শেষ পরিণতিতে মিথ্যা হইতে, হিংসা হইতে, সংস্কারের কঠিন বাঁধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির* যেমন শ্রেয়োজীবনে অভিসার পাইয়াছি, তেমনি গুণবতীকেও শ্রেয়োজীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছি।
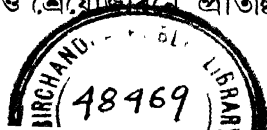
গোবিন্দমাণিক্যকে নূতন করিয়া পাইবার সাধনা শুরু হইয়াছে তাঁহার জীবনে। রাণী গুণবতী প্রেমের মহিমা বুঝিয়াছেন। নাটকে মৃত্যু ভেদ করিয়া অমৃত ঝরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডী নাটকে লীয়ার বা হ্যামলেটের নিঃসীম নৈরাশ্য কোথাও নাই। তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটকের পরিণামে ভয় ও করুণার আতঙ্ক নাই। ট্র্যাজেডীর বিবর্ণ বিষণ্ণতা রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকের পরিণতিতে পাই না। তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটকগুলি নবতর আনন্দের সন্ধান দিয়াছে। তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটকের রস-পরিণাম শান্তরস।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই নারী মোহমুক্তির সহায়িকা। প্রকৃতির প্রতিশোধে ইহার সূচনা পাওয়া গিয়াছিল। ডক্টর টমসন (E. J. Thompson) এই দিক দিয়া প্রকৃতির প্রতিশোধের সহিত বিসর্জন নাটকের মিল দেখিতে পাইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

In all these plays it is the woman who brings truth near, and often the woman who is a mere child.

নারী রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাণময়ী সৌন্দর্যপ্রতিমা। ইহারা সকলকে ডাক দিয়াছে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য—unreality হইতে মুক্তি দেওয়া ইহাদের কাজ। মোহের তম হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য নাটকের মধ্যে ইহাদের আবির্ভাব। ইহাদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে একটা দুর্জয় শক্তি, অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা। ইহারা মানুষের জড়ত্ব ঘুচাইবার জন্য, মানুষকে তাহার অস্বাভাবিকতা ও বিকৃত জীবন হইতে মুক্ত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোকরশ্মি—আলোকের দূতী। গাছ যেমন আলোকরশ্মিকে অনুসরণ করিয়া তাহার ডালপালা মেলিয়া দেয়, এই সকল নারীকে অনুসরণ করিয়া মানুষও তেমনই করিয়া

নিজের সঙ্কুচিত অবস্থাটাকে কাটাইয়া উঠিয়া নিজেকে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছে, নিজেকে বৃহত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে।

এমনিতর নারীকে আমরা পাইয়াছি—প্রকৃতির প্রতিশোধে, রাজা ও রাণীতে, বিসর্জনে, রক্তকরবীতে। ইহাদের আবির্ভাবে নূতন এক সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বাজিয়াছে। সে সঙ্গীত প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীকে ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি সম্পর্কে অবহিত করে। রাজা বিক্রমদেবকে কর্তব্যে ও কল্যাণধর্মে অনুপ্রাণিত করিতে চায়। বিসর্জনের গোবিন্দমাণিক্যকে দুর্জয় শক্তির অধিকারী করে। জয়সিংহকে এক অপরূপ বেদনায় ব্যাকুলিত করে। প্রথাবদ্ধ জীবনের গণ্ডির মধ্যে বন্দী জয়সিংহের কণ্ঠ হইতে এই উক্তি বাহির হইয়া আসে—

> তোমার মন্দিরে এ কি নূতন সঙ্গীত
> ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
> করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে !

এমনই এক নারী রক্তকরবীর রাজার মধ্যে অভ্যস্ত জীবনের বাহিরে পদক্ষেপের প্রেরণা জাগাইয়াছে—যন্ত্রের জাল হইতে মুক্তির শক্তি জোগাইয়াছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী, রাজা ও রাণীর বিক্রমদেব, তপতী নাটকের নায়কচরিত্র বিক্রম, বিসর্জনের রঘুপতি, রক্তকরবীর রাজা—ইহারা সকলেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নারীর সংস্পর্শে আসিয়া, সত্যের অমৃতস্পর্শ লাভ করিয়া ইহারা সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রেম ইহাদিগকে সমস্ত মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি দিয়াছে।

রাজা ও রাণী নাটকে যেমন সুমিত্রা, বিসর্জন নাটকে যেমন

পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্প 'বিসর্জন'-এ ব্যবহৃত। দ্বাত্রিংশ, ত্রয়স্ত্রিংশ, ষট্‌ত্রিংশ ও সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ হইতে নক্ষত্র রায়ের বিদ্রোহের ঘটনাও 'বিসর্জন'-এ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'রাজর্ষি'র অন্যান্য পরিচ্ছেদে বর্ণিত কোনো কাহিনী 'বিসর্জন'-এ গৃহীত হয় নাই। 'রাজর্ষি'র গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্র রায়, রঘুপতি, জয়সিংহ ও ধ্রুব—এই কয়টি চরিত্রই 'বিসর্জন'-এ দেখিতে পাওয়া যায়। 'রাজর্ষি'র হাসি, তাতা, কেদারেশ্বর, বিল্বন, সুজা প্রভৃতি চরিত্র 'বিসর্জন'-এ নাই। ধ্রুব-র ভূমিকা 'রাজর্ষি'র অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু 'বিসর্জন'-এ উহা নিতান্তই একটি গৌণ চরিত্র। নাটকের প্রয়োজনে মাত্র দুইটি দৃশ্যে তাহার উপস্থিতি। উহার মধ্যে একটি দৃশ্যে তাহার মুখে একটিমাত্র কথা, অপর দৃশ্যে সে নিদ্রিত ও নির্বাক। 'বিসর্জন'-এর গুণবতী, অপর্ণা, নয়ন রায়, চাঁদপাল এবং পৌরগণ সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি।

উভয় গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যেও বহু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'রাজর্ষি' ঐতিহাসিক উপন্যাস। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে উহা যে খুব সার্থক সৃষ্টি এমন কথা বলা চলে না। যদিচ উহার মধ্যে ত্রিপুরার বিশিষ্ট পরিবেশ, ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যচ্যুতি ও ভাগ্যবিপর্যয়ের বিস্তৃত কাহিনী, ত্রিপুরার অধিবাসী-দের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথাপদ্ধতির খুঁটিনাটি বিবরণ রহিয়াছে, তথাপি ঐগুলি একটা অর্থহীন আশ্রয় মাত্র; ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপনা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নাই। গোবিন্দমাণিক্য অথবা রঘুপতি ইঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি ধর্ম ও প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ প্রতিমূর্তি; ইতিহাসের নায়ক না হইলেও

ইঁহাদের কোনোও ক্ষতি ছিল না। অপরপক্ষে, 'বিসর্জন'-এর কয়েকটি চরিত্রই শুধু ঐতিহাসিক, কিন্তু ইতিহাসের নামগন্ধও উহাতে নাই—থাকিবার কথাও নয়। 'বিসর্জন'কে কেহই ঐতিহাসিক নাটক বলিবেন না। অধিকন্তু, 'রাজর্ষি'তে যে সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা একটি বিশেষ যুগের, একটি বিশেষ দেশ ও একজন বিশেষ রাজার সমস্যা। কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকের বিষয়ীভূত সমস্যা কোনো বিশেষ যুগ, দেশ বা পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাহা মানবসাধারণের চিরন্তন সমস্যা। তাই গ্রন্থ দুইটির গোত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ঘটনা এবং চরিত্র-দ্বন্দ্বের দিক হইতেও 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন'-এর প্রভেদ বড় কম নয়। যদিচ উভয় গ্রন্থের মূল ভাববস্তু প্রেম ও প্রথার সংঘাত, তথাপি এই সংঘাত 'রাজর্ষি'তে বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু 'বিসর্জন'-এ উহা স্পষ্টতর ও তীব্রতর। 'রাজর্ষি'তে দেখিতে পাই, হাসির মৃত্যু দেখিয়াই গোবিন্দমাণিক্যের মনে বলির বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব জাগ্রত হইয়াছিল, কিন্তু 'বিসর্জন'-এ ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার ক্রন্দনই গোবিন্দমাণিক্যের মনে বলি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জাগাইয়াছে। 'রাজর্ষি'তে বলি বন্ধের আদেশ দানের পরেও গোবিন্দমাণিক্যের মন মাঝে মাঝে সংশয়ের মধ্যে দোল খাইয়াছে, কিন্তু 'বিসর্জন'-এ ঐরূপ আদেশ দানের পর গোবিন্দমাণিক্যের মন দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থির, অবিচল; সেখানে কোনোরূপ দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নাই।

উভয় গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট অসাধারণ চরিত্র রঘুপতি। কিন্তু 'রাজর্ষি'র রঘুপতি ও 'বিসর্জন'-এর রঘুপতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। 'রাজর্ষি'র রঘুপতি কোনো বিশেষ আদর্শের আলোকসম্পাতে তেমন উজ্জ্বল নহেন, কিন্তু 'বিসর্জন'-এর

রঘুপতি একটি বিশেষ আদর্শের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে যে ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা আমাদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতির চিত্তে উহার প্রভাব বর্ণনার ব্যাপারেও উভয় গ্রন্থে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। 'রাজর্ষি'তে দেখিতে পাই, জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন এবং নক্ষত্র রায়ের নির্মম অবহেলা ও অপমানের ভিতর দিয়াই শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। কিন্তু 'বিসর্জন'-এ এই পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে জয়সিংহকে হারানোর সুগভীর বেদনাবোধ। দৃঢ়চেতা রঘুপতির মধ্যেও যে একটি স্নেহকাতর হৃদয় লুকাইয়া ছিল, বিসর্জনে তাহা প্রদর্শিত। জয়সিংহের মৃত্যু যেন রুদ্ধদ্বার গুহামুখ হইতে একটি পাথর সরাইয়া রঘুপতির স্নেহের উৎসকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে 'বিসর্জন'-এর পরিবর্তন যে শিল্পরীতির দিক হইতে সুন্দরতর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। উভয় গ্রন্থের পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে দূরতম পার্থক্য। 'রাজর্ষি'র একান্ত নীরস ঐতিহাসিক তথ্য-বর্ণনামূলক উপসংহার শিল্পসুষমাহীন। পাঠকচিত্তে উহা কোনরূপ সাড়া জাগাইতে পারে না। সামান্য কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও 'বিসর্জন' নাটকের পরিসমাপ্তি নাটকোচিত হইয়াছে। জয়সিংহের মৃত্যুর দৃশ্যেই নাটকের সত্যকার সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল—রঘুপতি চরিত্রের পরবর্তী পরিবর্তনে নাটকের রস অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তথাপি উভয় গ্রন্থের সমাপ্তির তুলনায় 'বিসর্জন'-এর পরিণতি অধিকতর প্রাণপূর্ণ। দুইটি গ্রন্থের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডির উপকরণ থাকিলেও 'রাজর্ষি'র চরিত্রগুলিতে ট্র্যাজেডি অস্ফুটই রহিয়া গিয়াছে ; অপরপক্ষে 'বিসর্জন'-এর চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিতে ট্র্যাজেডির কারুণ্য সুপরিস্ফুট।

'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন'-এর মধ্যে আরও একটি প্রভেদ চোখে না পড়িয়া পারে না। উহা প্রকৃতিবর্ণনা। উপন্যাসে প্রকৃতিবর্ণনা সর্বত্র বইটিকে সজীব সরস ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু নাটকে সেই বর্ণনা অনুপস্থিত। অবশ্য নাটকে প্রকৃতি-বর্ণনার অবকাশ নাই, তাই 'বিসর্জন'-এ উহার স্থান সংগত কারণেই একান্তভাবে গৌণ। উপন্যাস হিসাবে 'রাজর্ষি' তেমন কোনো সার্থকতায় মণ্ডিত হইতে পারে নাই। কিন্তু নাটক হিসাবে 'বিসর্জন' যে অধিকতর সার্থক, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু একটি বিষয়ে উভয় গ্রন্থের মধ্যে খুব বড় একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই রবীন্দ্র-মানস "স্নেহ-প্রেম-প্রীতিপূর্ণ উদার মুক্ত-প্রাণের অখণ্ড শান্তির সন্ধান" করিয়াছে, উভয় গ্রন্থেই সকল দ্বন্দ্বের অন্তরালে একটি কোমল রসাস্পদ ফল্গুধারা প্রবাহিত হইতেছে।

'বিসর্জন' একটি ট্র্যাজেডি নাট্য। এই নাটকের পাঁচটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারিটি, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে চারিটি—মোট একুশটি দৃশ্যে নাটকটি বিভক্ত। নাটকের এই বিভাগ, দৃশ্য-বিন্যাস ও ঘটনা-বিন্যাস, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের রীতি প্রভৃতি শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। শেক্‌স্‌পীয়র—তথা প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য নাটকেও পাঁচটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—Exposition, Growth অথবা Development, Climax, Fall এবং Catastrophe—এই পাঁচটি ভাগই পাঁচটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে বা Exposition-এ ক্রিয়ার বীজ বপন করিয়া নাটকের ভবিষ্যৎ গতির আভাস জানাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে বা Growth of Action-এ নাটকীয় ঘটনা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। তৃতীয় অঙ্কে বা Climax-এ

নাট্যকলার চরমোৎকর্ষে—উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবল সংঘাতে দর্শকের মন আবেগ-কম্পমান হইয়া উঠে। চতুর্থ অঙ্কে বা Fall-এ থাকে ঘটনার আবেগ ও দ্রুততার পতন এবং শেষ অঙ্কে বা Catas-trophe-তে প্রত্যাশিত বিয়োগ (বা মিলন) ঘটিয়া থাকে। তবে ট্র্যাজেডিতে দেখা যায়—নাটকের শেষাংশেই থাকে Climax এবং পরবর্তী পর্যায় দুইটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। 'বিসর্জন'-এও যে প্রধানত সেই নাট্যরীতিই অবলম্বিত হইয়াছে, উহার অঙ্ক ও দৃশ্য বিশ্লেষণে তাহা পরিস্ফুট হইবে। সেই সঙ্গে প্রতিটি দৃশ্যের তাৎপর্যও আমরা অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইব।

'বিসর্জন'-এর প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শুরু মন্দিরে—নিঃসন্তান রাণী গুণবতীর সন্তান-কামনার মধ্য দিয়া—

আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে, বসে আছি
তপ্ত বক্ষ শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে

এমন সময় রাজপুরোহিত রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মার পূজা তো চিরদিনই তিনি করিয়া আসিতেছেন। তবে কোন্ দোষে কুমার-জননী মহামায়া তাঁহাকে 'নিঃসন্তান শ্মশানচারিণী' করিলেন? রঘুপতি বলিলেন, মহামায়া ইচ্ছাময়ী, সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। যাহাই হোক, এবার রাণীর নামেই মায়ের পূজা হইবে, তাহা হইলেই শ্যামা প্রসন্না

হইয়া রাণীকে সন্তানবতী করিবেন। এই আশ্বাসে স্বার্থান্ধ রাণী দেবীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবী যদি তাঁহাকে সন্তান দান করেন তবে উহার বিনিময়ে তিনি প্রতি বৎসর দেবীর সন্তোষ-বিধানের জন্য একশত মহিষ ও তিনশত ছাগ বলি দিবেন।

এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক-শো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

(রাণীর এই প্রতিজ্ঞায় রাজার সহিত ভবিষ্যৎ বিরোধের সূত্রপাত।)

প্রথা ও প্রেমের সংঘাতই 'বিসর্জন' নাটকের মূল ভাববস্তু। কবি এখানে সুকৌশলে প্রথমে প্রথার স্বরূপটির আভাস জানাইয়াছেন। প্রথা একটি প্রাণের জন্য শত শত প্রাণ বলি দিতেও পরাঙ্মুখ নয়। প্রথা-সংস্কার মানুষকে স্বার্থান্ধ করে, মানুষকে ছোট করে। নাটকের প্রথমেই তাহার আভাস।

প্রথম দৃশ্যে গুণবতী ও রঘুপতির প্রস্থানের পর প্রবেশ করিলেন ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্য, ভিখারিণী বালিকা অপর্ণা ও রাজমন্দিরের সেবক জয়সিংহ। অপর্ণার ছাগশিশু ধরিয়া আনিয়া মন্দিরে মায়ের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, অপর্ণা তাই রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। অপর্ণার ব্যথার ভিতর দিয়া রাজার মনেও বলি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছে এবং উহাই জয়সিংহের প্রতি প্রশ্নের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে—"এ দান কি নেবেন জননী প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?" জয়সিংহ অবশ্য দেবতার প্রতি বিশ্বাসী, আবার সে উদারচিত্তও বটে। তাই অপর্ণার আকুলতা দেখিয়া মহারাজকে সে বলিল—

আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।

জয়সিংহের এই উক্তির মধ্যে রহিয়াছে নাটকীয় গূঢ় ইঙ্গিত বা Dramatic Irony ; ইহা যেন জয়সিংহের অপরিহার্য পরিণামের পূর্বাভাস।) জয়সিংহ অপর্ণাকে বলিয়াছে, মা যাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে ফিরাইয়া দিবার সাধ্য জয়সিংহের নাই। শুনিয়া অপর্ণা তীব্র প্রতিবাদ করিল। বলিল—

মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা ! রাক্ষসী নিয়েছে তারে !

অপর্ণা মূর্তিমতী করুণা, সে সত্যধর্মের হিংসাশূন্যতা প্রচার করিল। সে স্পষ্টবাদিনী, তেজস্বিনী। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে বলিয়া দিল যে, মাতার ধর্ম মমতা, করুণা ; আর রাক্ষসীর ধর্ম হিংসা। অতএব যে রক্তলোলুপা, সে রাক্ষসী নয় তো কী ? কুসংস্কারাচ্ছন্ন জয়সিংহের মন কিন্তু ইহাতে সায় দিল না। গোবিন্দমাণিক্যও সন্দেহদোলায় প্রায় বাক্যহীন, নিজেকেই প্রশ্ন করিলেন—"এত ব্যথা কেন, এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?" রাজা এবং অপর্ণার কথাতে জয়সিংহের মনেও দ্বিধা দেখা দিল—সংস্কার ও হৃদয়ধর্মে দ্বন্দ্ব বাধিল—"করুণায় কাঁদে প্রাণ মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর !" জয়সিংহের এই সহানুভূতিসম্পন্ন প্রাণের পরিচয় অপর্ণার মনে এক নূতন ভাব, জয়সিংহের প্রতি নূতন আকর্ষণ জাগাইয়া তুলিল। জয়সিংহকে সে মন্দিরের করুণাহীন পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইতে আহ্বান জানাইল। কিন্তু জয়সিংহের মন হইতে তখনও সন্দেহের কুয়াশা অপসৃত হয় নাই, তাই সে বলিল, "কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে ? কোথায় আশ্রয় আছে ?" গোবিন্দমাণিক্য উত্তর দিলেন, "যেথা আছে

প্রেম !” জয়সিংহ অপর্ণাকে নিজের কুটীরে লইয়া গেল। এই-খানেই প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি। এই দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্যের শেষ উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘প্রেম’ কথাটির ভিতর দিয়া কবি নাটকে নূতন একটি শক্তির আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন; অপর্ণা এবং গোবিন্দমাণিক্য যে সেই প্রেমেরই প্রতিভূ বা প্রতীক হইবেন, ইহারও একটা ক্ষীণ আভাস যেন উহাতে আছে। কবি তাঁহার এ নাটকের প্রথমেই ক্রিয়ার বীজ বপন করিয়াছেন; অর্থাৎ প্রথা ও প্রেমকে নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন এবং নাটকের ভবিষ্যৎ গতিরও কিছুটা ইঙ্গিত দিয়াছেন।

‘বিসর্জন’-এর প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সংঘাতের বীজ এইখানেই উপ্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গত এই বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

“নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রাণী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয় নি বলে সন্তান লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন—‘আমাকে দয়া ক’রে সন্তান দাও। আমার সব আছে, দাস দাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই, কিন্তু আমার তপ্ত বক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আরেকটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী হবে।’ শিশু তো একটুকু প্রাণের কণিকা, কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালবাসা অর্পণ করবে।

“নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে, প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশী! একদিকে রাণী মানত করেছেন যে, বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন; অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালবাসাটুকু ভোগ

করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ; অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝেছেন। সুতরাং রাণীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে—তিনি জানছেন যে, ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হতে পারে যে, তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে—আবার অপরপক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে নি।

"তারপর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। [এখানে রবীন্দ্রনাথ যে কোনো কারণেই হোক, একটি ভুল করিয়াছেন। কারণ, প্রথম অঙ্কে অথবা অন্য কোনো অঙ্কে অপর্ণা গুণবতীকে কিছুই বুঝায় নাই। সমগ্র নাটকের মধ্যে অপর্ণার সঙ্গে গুণবতীর কোনোরূপ আলাপ হওয়া তো দূরের কথা, একমাত্র নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যটি ছাড়া অন্য কোথাও তাদের মধ্যে সাক্ষাৎও হয় নাই এবং ঐ সাক্ষাতের সময়েও উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হয় নাই; অধিকন্তু গুণবতীকে কিছু বুঝাইবার প্রয়োজনও আর তখন ছিল না।]—সে বললে—তুমি যদি একদিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে, প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে পালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও? বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণহত্যায় খুশী হন?—যদি তিনি তা বোঝেন, তবে কেমন ক'রে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ?—মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কী করে বিশ্বে প্রকাশ পায়, অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটা বলে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজী আছেন—অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে, এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

"প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্যদল তা বোঝে নি,—তাই দুই দলে বিরোধ বাধল। গুণবতী ও রঘুপতি একদিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্যদিকে।"

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য রাজসভা। সেই সভায় প্রথমেই গোবিন্দমাণিক্য দৃঢ় আদেশ ঘোষণা করিলেন—"মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে হইল নিষেধ।" মন্ত্রী, সেনাপতি নয়ন রায় এবং

রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায় তিনজনেই এই আকস্মিক ঘোষণায় সচকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিচলিত হইলেন রাজপুরোহিত রঘুপতি। তিনি বলিলেন—এ কি স্বপ্নে শুনি ?

উত্তরে রাজা গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন—

স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি রাজার এই আদেশকে মানিয়া লইতে পারিলেন না। বলিলেন,—

মহারাজ, কী করিছ ভাল করে ভেবে
দেখ। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ।" রঘুপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে 'পাষণ্ড', 'নাস্তিক' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার সংকল্পে অবিচল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন দণ্ড।

ক্রুদ্ধ রঘুপতি রাজাকে অভিসম্পাত দিলেন। প্রস্থানের পূর্বে রাজার বিরুদ্ধে স্পষ্টতই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া গেলেন, যতক্ষণ তিনি মায়ের সেবক আছেন, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই বলি নিষিদ্ধ হইতে দিবেন না।

রঘুপতি চলিয়া গেলে, নয়ন রায় এবং মন্ত্রী উভয়েই রাজাজ্ঞার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলেন। ইহা সেই প্রশ্ন, কুসংস্কারাবদ্ধ

মানুষ চিরকাল যাহা করিয়া আসিতেছে। সেই সনাতনতার দোহাই—যাহা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা কখনও পাপ হইতে পারে না। গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে কিছুটা চিন্তাকুল হইলেও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীর প্রতি আদেশ দিয়া গেলেন—

যাও মন্ত্রি, আদেশ প্রচার করো গিয়ে
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি এইখানে। পূর্ব-দৃশ্যে যে-বিরোধের আভাস দেখা গিয়াছিল, এই দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্যের বলিবন্ধের আদেশ এবং উহার বিরুদ্ধে রঘুপতির বিদ্রোহ ঘোষণা সেই বিরোধকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিল। ভবিষ্যতে সংঘাত কী রূপ গ্রহণ করিবে, এই কৌতূহল জাগ্রত করার মধ্যেই দৃশ্যটির সার্থকতা।

তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভেই দেখা যাইতেছে, জয়সিংহ একাকী মন্দিরে দেবী-প্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া আপনার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিতেছে। দেবী-প্রতিমার কাছে থাকিয়াও সে আপনাকে মনে করিতেছে বড়ই নিঃসঙ্গ। এমন সময় গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণা প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠেও সেই নিঃসঙ্গতার সংগীত, সেও ফিরিতেছে পথের সন্ধানে। এই নিঃসঙ্গতাই যেন দুইজনকে বড় কাছাকাছি লইয়া আসিল। জয়সিংহকে তাই সে বলিল—

জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা। তাই দেখিয়াছি কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।

আর নিজের সম্বন্ধেও বলিল—

এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

এমন সময় রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া অপর্ণা সভয়ে প্রস্থান করিল। রঘুপতিকে তাহার বড় ভয়।

(রঘুপতি প্রবেশ করিতেই জয়সিংহ তাঁহার সেবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু রঘুপতি তখন সদ্য রাজসভা হইতে আসিতেছেন; তাঁহার মন তিক্ত, ক্ষুব্ধ। তাই তিনি বিরক্তিভরে সেই সেবা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার মনে তখন আগুন জ্বলিতেছে।) রোষে ক্ষোভে ভাবিয়াছেন—কলির দেবতারাও যেন নিষ্ক্রিয়, শক্তিহীন। কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ নাই। কলির ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের রোষাগ্নিতে সিংহাসনের দম্ভ ভস্মীভূত হইবে।

তবে ক্ষণপরেই তিনি বুঝিলেন, জয়সিংহের প্রতি বড় রূঢ় আচরণ করা হইয়াছে। স্নেহকোমলকণ্ঠে তিনি উহা স্বীকার করিলেন। জানাইলেন, অহঙ্কারে স্ফীত গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরীকে অপমান করিতেও দ্বিধা করেন নাই। গোবিন্দ-মাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল, তাই সে রঘুপতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। রঘুপতি তাহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভৎসনা করিলেন, কারণ জয়সিংহের কাছে গোবিন্দমাণিক্য আজ রঘুপতির অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছেন; অথচ রঘুপতিই শিশুকাল হইতে জয়সিংহকে বহু যত্নে ও স্নেহে পালন করিয়া আসিয়াছেন। মন্দিরে বলি নিষিদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা করিল,

এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

আবার সেই প্রাণের কথা। জয়সিংহ সম্পর্কে আবার ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত জানাইয়া তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি। এই দৃশ্যটির তাৎপর্য জয়সিংহ ও অপর্ণার মধ্যে একটি প্রেমস্নিগ্ধ সম্পর্ক-স্থাপনের

মধ্যে—হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্বের অন্তরালে দুইটি নিষ্পাপ সরল ভালোবাসা-উন্মুখ হৃদয়ের মিলন-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

চতুর্থ দৃশ্যের স্থান অন্তঃপুর। পরিচারিকার মুখে গুণবতী সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পূজার বলি মন্দির হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজার আদেশেই যে ইহা ঘটিয়াছে, ভয়ে পরিচারিকা সে-কথা বলিতে পারিল না। রাণী তখন রঘুপতিকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এমন সময় গোবিন্দমাণিক্য প্রবেশ করিলেন। গুণবতী তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন, কে তাঁহার বলি ফিরাইয়া দিয়াছে। রাজা বলিলেন যে, তাঁহার আদেশেই দেবতার নামে জীবরক্তপাত ত্রিপুররাজ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহাতে রাণী যদি ব্যথা পাইয়া থাকেন, তবে সেই অপরাধের জন্য রাজা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। গুণবতীর মনে তখন স্বামীর প্রতি নিদারুণ অভিমান জাগিয়া উঠিল। একদিকে তাঁহার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, অপরদিকে স্বামীর প্রতি অভিমান—দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। তিনি স্বামীর নিকট জানিতে চাহিলেন, কেন তিনি অজ্ঞানের মতো কাজ করিলেন। রাজা বলিলেন, তিনি মনের মধ্যে করুণাময়ী বিশ্বজননীর আজ্ঞা অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার আর কোনো দ্বিধা নাই—

—স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী তথাপি তাঁহার সংকল্পে অটল। বলিলেন, আমি দেবীর কাছে বলি দিতে প্রতিশ্রুত, যেমন করিয়া হোক, 'যথাশাস্ত্র যথাবিধি

পূজিব তাঁহারে।' হয় তো কালক্রমে রাণীর এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রস্থান করিলেন। ইহার পরেই উপস্থিত হইলেন রঘুপতি। রাজদর্প যে দেবতার অধিকারকেও গ্রাস করিতে চাহিতেছে, এই কথাই তিনি বুঝাইতে চাহিলেন গুণবতীকে। ইহার পরিণাম যে কী ভয়ংকর তাহা জানাইয়া দিতেও ভুলিলেন না। বলিলেন,

যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্ব সম।—

অভ্রভেদী রাজমহিমা 'মুহূর্তে হইয়া যাবে ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।' এমন কি, ব্রহ্মতেজের 'অক্ষমতা ও নিষ্ফলতাকে ধিক্কার' দিবার জন্য স্বীয় উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন।

(একদিকে রাজার বিরুদ্ধাচারিণী হইলেও গুণবতী স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী। ব্রাহ্মণকে পৈতা ছিঁড়িতে উন্মুখ দেখিয়া স্বামীর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।) রঘুপতির নিকট কাতর মিনতি জানাইলেন, স্বামীর অমঙ্গলে তো তাঁহারও অমঙ্গল হইবে অথচ তিনি তো নিরপরাধা, নিরপরাধাকে ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া রক্ষা করুন। রঘুপতি দাবি করিলেন, "ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।" গুণবতী অঙ্গীকার করিলেন, তাহাই হইবে। পূজার ব্যাঘাত তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। রঘুপতি কিছুটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে গোবিন্দমাণিক্য আবার ফিরিয়া আসিলেন। রাণীর 'অপ্রসন্ন মুখ' তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিতেছিল। কিন্তু গুণবতী তাঁহাকে তো সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেনই না, বরং অধিকতর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, তিনি যেন সেই গৃহে আর

না আসেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ যেন সেখানে টানিয়া না আনেন। রাজা শান্ত কণ্ঠে গুণবতীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, প্রেমই অভিশাপ নাশ করে, দয়া অকল্যাণকে দূর করে। 'সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে পতিগৃহে লাগে অভিশাপ।' কিন্তু ইহাতেও যখন রাণীর মন গলিল না, রাজা তখন প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রাজাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গুণবতীর অভিমান পরাজয় স্বীকার করিল। তিনি গোবিন্দমাণিক্যের পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিলেন। সেই সঙ্গে বলি সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতেও অনুরোধ জানাইলেন। রাজা কিন্তু 'চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা'কে প্রশ্রয় দিতে চাহিলেন না। পারিবারিক প্রেমেও যে হিংসার নিষ্ঠুর ধারা আসিয়া মিশিয়াছে, ইহাতে গোবিন্দ-মাণিক্য অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি রাণীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। গুণবতীর মনে হইল, তিনি পুত্রহীনা বলিয়াই রাজা তাঁহাকে এমনভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেন। তাঁহার অন্তরে আবার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, 'ধূলিতলে নতশির' হইয়া আর থাকিবেন না। তিনি হইবেন "উর্ধ্বফণা ভুজাঙ্গিনী আপনার তেজে।"

এই চতুর্থ দৃশ্যটিতে আমরা দেখিতে পাই, নাটকীয় সংঘাত আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বলি বন্ধের আদেশের প্রভাব রাজান্তঃপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উহার ফলে পারিবারিক প্রেমবন্ধনে পর্যন্ত ভাঙন ধরিয়াছে। দৃশ্যটির তাৎপর্য এইখানেই।

বলি বন্ধের আদেশ জনসাধারণের মনে যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, মন্দিরে সমবেত একদল লোকের কথাবার্তার মাধ্যমে উহার প্রকাশ দ্বারাই শুরু হইয়াছে পঞ্চম দৃশ্যের। প্রথা ও সংস্কারে আচ্ছন্ন জনতার এই কৌতুকপূর্ণ সংলাপের মধ্য দিয়া

পূর্ববর্তী দৃশ্যসমূহের গম্ভীর পরিবেশকে কিছুটা লঘু করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নাটকে এরূপ relief scene অপরিহার্য। ইহা বিসর্জন গোত্রের নাটকের অন্যতম আঙ্গিক।)

বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদের দাবি মিটাইয়াছেন, আবার বাস্তবতার দাবিও মিটাইতে গিয়াছেন। বাস্তবতার দাবি মিটাইতে গিয়া তাঁহাকে তাঁহার এই নাটকে জনতাকে আনিতে হইয়াছে। বলি বন্ধের আদেশে জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্য অনেক নাটকে জনতাকে আনিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' জনতার কথোপকথন আছে। সেখানে দেখানো হইয়াছে পৃথিবীর মানুষ কত বিচিত্র। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র জনতায় সন্ন্যাসীর উদাসীনতার বিপরীত চিত্র। সেখানে জনতার উৎসব-উল্লাস সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীকে জীবনের স্নেহমমতার আস্বাদন দিয়াছে, জীবনের সহজ আনন্দ-উদ্বেল দিকটির সহিত সন্ন্যাসীর পরিচয় ঘটাইয়াছে। জনতা সন্ন্যাসীকে তাহার আদর্শের শূন্যগর্ভতা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে। জনতার ভূমিকা সেখানে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ।

'রাজা ও রাণী'তে যে জনতা আছে, তাহাদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে বিদ্রোহের বহ্নি। কাশ্মীরের জনসাধারণ কখনও বা কুমার সেনের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য দেখাইয়াছে, কখনও বিক্রমদেবের আক্রমণে যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাকে প্রকট করিয়াছে। মোট কথা, এই সব নাটকে জনসাধারণ শুধু অলস কবিকল্পনা বা পরিহাসরসিকতার উপলক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড়ে নাট্যক্রিয়ার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াছে।

'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্রের পীড়নে জনতার কান্না শোনা গিয়াছে।

সুমনের জন্য অম্বার কান্না সেখানে থাকিয়া থাকিয়াই উত্থিত হইয়াছে। পাগল বটুকের আতঙ্ক বারে বারেই প্রকাশ পাইয়াছে। 'ডাকঘর' নাটকে দইওয়ালা আছে, প্রহরী আছে, ছেলের দল আছে। দইওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়া অমলের মন চকিতে এক কল্পলোকের দ্বারপ্রান্ত ছুঁইয়া আসে। তাহাতে অমল সান্ত্বনা পায়, শান্তি লাভ করে। প্রহরী যখন ঘণ্টা বাজায়, সেই ঘণ্টা শুনিয়া অমলের মন দূরাভিসারী হয়। তাহার মনে জাগে একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা। যে দেশ কেহ কখনো দেখে নাই, 'যে দেশের কথা কেউ জানে না, সেই অনেক দূরে' অমলের মন বদ্ধঘরের গণ্ডি কাটাইয়া উধাও হয়। ছেলের দলকে দেখিয়া তাহার মন ছুটির খুশিতে ভরিয়া উঠে। 'রক্তকরবী' নাটকে যে জনতা আছে, তাহাদের মধ্য দিয়া একটা পীড়নের ছবি—একটা চাপা কান্না, একটা ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের আভাস পাওয়া গিয়াছে।

বিসর্জনের জনতা ভক্তিমূঢ়। তাহারা ধর্মের প্রথাকেই জানিয়াছে, হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় বিচারে সামর্থ্যহীন। বিসর্জনের জনতা এ নাটকে অপরিহার্য নয়। জনতা এখানে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। সাধারণ মানুষ প্রথাসংস্কারের দাস—সেই প্রথাসংস্কারের আনুগত্যটুকু মাত্র তাহাদের ভিতর দিয়া ফোটানো হইয়াছে। তাহারা বহুকাল ধরিয়া দেবীর কাছে বলি দেখিয়া আসিয়াছে, তাই তাহাদের কাছে বলিবন্ধের আদেশ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। উহাতে তাহাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও ক্ষোভ জাগিয়াছে। চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ তাহারা করিতে পারে নাই। দেশে যে সকল বিপদ আসিয়াছে, তাহার জন্য তাহারা রাজাকেই দায়ী করিয়াছে—রাজার অন্যায় আদেশ উহার মূলে,

একথা ভাবিয়াছে। রঘুপতি যখন দেবীর মুখ ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে দেবী বিরূপ, তখন তাহারা আতঙ্কিত হইয়াছে এবং রাজার মৃত্যুকামনা করিয়াছে। জনতার বিচার-শক্তিহীনতা এই ঘটনার পরে আরও স্পষ্ট হইয়াছে, অপর্ণা যখন দেবীর মুখ ফিরাইয়া দিয়া বলিয়াছে—

বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো মা সমুখে একবার!
[প্রতিমা ফিরাইয়া]
এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

অপর্ণার এই উক্তিতে জনতা সকল অভিযোগ ভুলিয়া সোল্লাসে বলিয়াছে—

ফিরেছে জননী!
জয় হোক! জয় হোক!

বিসর্জনের জনতা সংস্কারান্ধ—তাহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই তাহারা বড়ো বলিয়া মানিয়াছে। এই নাটকের জনতা তাহারা কোনো বড়ো আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে নাই।

জনতার আচরণের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। তাহারা ভীরু মেরুদণ্ডহীন। জয়সিংহের ভাষায়—

প্রাণ ভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন আগে হতে রয়েছে মরিয়া।

জনতার প্রস্থানের পরেই রঘুপতি, নয়ন রায় ও জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন। রঘুপতি সেনাপতি নয়ন রায়কে রাজার বিরুদ্ধে নানাভাবে উত্তেজিত ও বিদ্রোহে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু রাজভক্ত নয়ন রায় বিশ্বাসঘাতক হইতে চাহিলেন না, রঘুপতির কূট তর্কের বিপাকে পড়িতে সম্মত হইলেন না। তিনি এই স্পষ্ট উক্তি করিয়া চলিয়া গেলেন—

আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়ন রায়।

সেনাপতিকে রাজদ্রোহী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রঘুপতি পুরবাসিগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। তাহাদের দ্বারা মন্দিরের দ্বার-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বলিসহ দেবীপূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দমাণিক্য সেখানে উপস্থিত হইয়া বলি বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন এবং সসৈন্য সেনাপতিকে ডাকাইয়া যাহাতে তাঁহার আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হয়, সেইরূপ নির্দেশ দিলেন। সেনাপতি নয়ন রায় সবিনয়ে জানাইলেন, তিনি রাজার এই আদেশ পালনে অক্ষম, কারণ রাজধর্ম ও দেবধর্ম পৃথক বস্তু। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তখন রাজা নয়ন রায়কে সেনাপতির পদ হইতে চ্যুত করিয়া দেওয়ান চাঁদপালের হাতেই সৈনাপত্যের ভার তুলিয়া দিলেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি চলিয়া গেলে, গোবিন্দমাণিক্য এই বলিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিলেন—'ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে।' জয়সিংহ তখন বলি নিষেধের আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য গোবিন্দমাণিক্যের পদতলে পড়িয়া একান্ত মিনতি জানাইতে লাগিলেন। ইহাতে রঘুপতি জয়সিংহকে মূঢ় বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে রাজার নিকট হইতে চলিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। তারপর 'দেখিব

রাজার দর্প কতদিন থাকে' বলিয়া জয়সিংহকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এইখানেই প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি।

প্রথম অঙ্কের এই সমাপ্তি-দৃশ্যটিকে আমরা সংঘাতের স্রোতোমুখে প্রাচীরবন্ধের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। প্রবল জলস্রোত কোথাও প্রতিহত হইলে যেমন দ্বিগুণ বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করে, রঘুপতির ব্রাহ্মণ্যদর্প যে রুদ্ধ আক্রোশে ভবিষ্যতে তেমনই বিক্রমে দেখা দিবে, সমাপ্তিতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। এক অঙ্ক হইতে আরেক অঙ্কের দিকে নাটকীয় ঘটনার গতিকে গড়াইয়া লইয়া যাওয়া এবং পাঠক ও দর্শকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করাই নাটকের ধর্ম। 'বিসর্জনে' এই ধর্ম যথাযথরূপে রক্ষিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান মন্দির। দৃশ্যের সূচনায় দেখা যাইতেছে, রঘুপতি তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এক নূতন পথ ধরিয়াছেন। তিনি রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে এইবার রাজদ্রোহী কবিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এইজন্য তিনি মিথ্যা একটি স্বপ্নকাহিনী বলিয়া নক্ষত্র রায়কে প্রলুব্ধ করিতে চাহিলেন—

কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

অবশ্য রঘুপতির এই মিথ্যাচারের মধ্যে নীচতার মিশ্রণ নাই। তাই নক্ষত্র রায় যখন বলিলেন যে, রাজা হইতে পারিলে তিনি রঘুপতিকেই মন্ত্রী করিবেন, তখন রঘুপতি সহজেই বলিতে পারিলেন, 'মন্ত্রিত্বের পদে পদাঘাত করি আমি।' নক্ষত্র রায়ের বুদ্ধি কম, তিনি জানিতে চাহিলেন, কবে তিনি রাজা হইবেন। রঘুপতি বলিলেন, 'রাজরক্ত আগে আন পরে রাজা হবে।' পরে আরও স্পষ্ট ভাষায় গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করিবার দিনক্ষণ পর্যন্ত বলিয়া দিলেন—"দেবীর আদেশ! রাজরক্ত চাই শ্রাবণের শেষ রাত্রে।"

রঘুপতি এইখানেই থামিলেন না, নক্ষত্র রায়কে প্রাণের ভয় দেখাইয়াও বলিলেন, যদি গোবিন্দমাণিক্য অব্যাহতি পান, তবে রক্তৃষিতা মহাকালী নক্ষত্র রায়ের শোণিতই গ্রহণ করিবেন। একবার যখন রাজরক্তের জন্য দেবীর আদেশ হইয়াছে, তখন যেমনভাবে হোক রাজরক্ত তিনি গ্রহণ করিবেনই, তা সে গোবিন্দ-মাণিক্যেরই হোক অথবা নক্ষত্র রায়েরই হোক। ইহা হইতে কিছুতেই মুক্তি নাই। অবশেষে তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়া কহিলেন, 'কার্যসিদ্ধি যত দিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।'

নক্ষত্র রায় চলিয়া গেলেন। জয়সিংহ সম্মুখেই ছিল। ভ্রাতৃ-দ্রোহিতার পরামর্শ শুনিয়া এতক্ষণ মাঝে মাঝে সে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, আর রঘুপতি তাহাকে নিরস্ত করিতেছিলেন। এইবার তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিল। সে গুরুদেবকে সক্ষোভে প্রশ্ন করিল, 'ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা'র মতো নিষ্ঠুর অধর্মের কাজ দেবীর আজ্ঞা বলিয়া তিনি কীরূপে প্রচার করিতে পারিলেন? রঘুপতি আত্মসমর্থনে বলিলেন, উহা ছাড়া আর কী উপায়ই বা আছে?—তাই বলিয়া এমন হীন উপায়? জয়সিংহের মনের এত-দিনকার পাপপুণ্যবোধ টলিয়া উঠিল। জয়সিংহের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি তখন হিংসার সপক্ষে নানারূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া জয়সিংহের মনের দ্বিধা কাটাইতে চাহিলেন। কিন্তু জয়সিংহের মনের সংশয় ঘুচিল না। তাহার অন্তরে প্রশ্ন জাগিল, তবে কী 'প্রেম মিথ্যা, স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব, সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা?' তাই যদি হয়, মা যদি রক্তৃষাতুরা হইয়া থাকেন, তবে জয়সিংহ কি নিজের বুকে ছুরি বসাইবে? সেই রক্ত মায়ের কাছে—'বড় কি লাগিবে ভালো?'

এখানে দেবীকে উদ্দেশ করিয়া জয়সিংহের 'নিবি মা আমার

রক্ত ?···দিব ছুরি বুকে ?' প্রভৃতি উক্তি আমাদিগকে পুনরায় ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ ঘটনার জন্য নাট্যকার আমাদের মনকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতেছেন। যাহা হোক, জয়সিংহ কিন্তু রঘুপতিকে সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'ভক্তিপিপাসিতা মাতা তাঁরে বল রক্তপিপাসিনী ?' উত্তরে রঘুপতি বলিলেন, 'বন্ধ হোক বলিদান তবে ?' একথায় জয়সিংহের মনে আবার দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া উঠিল, ফলে প্রথাগত সংস্কারই তাহার মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠিল। সে গুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বলিল—মহামায়া যদি রাজরক্ত চান, তবে সে নিজেই সেই রক্ত লইয়া আসিবে, তথাপি ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিবে না। কিন্তু রাজাকে হত্যা করিবার পথে অনেক বিপদ, রঘুপতি জয়সিংহকে সেই বিপদের পথে যাইতে দিতে অনিচ্ছুক। ইহার কারণও নিজেই খুলিয়া বলিলেন—

তোরে, আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

এখানে রঘুপতি-চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। লৌহকঠিন দৃঢ়তার মধ্যেও তাঁহার মনে প্রবাহিত হইতেছে স্নেহের ফল্গুধারা। ইহাই তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতার দিক। এই দৌর্বল্যই যে পরিণামে তাঁহার চরিত্রে ট্র্যাজেডি ঘটাইবে, লেখক এইজন্যই সুকৌশলে আমাদের মনকে এখন হইতেই প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। নাটকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ঘটনা-সংঘাতের জটিলতা এই দৃশ্যের অন্যতম তাৎপর্য হইলেও, রঘুপতি-চরিত্রের এই নূতন দিক প্রকাশই দৃশ্যটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য মন্দির। অপর্ণা সেখানে জয়সিংহকে খুঁজিতে আসিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যে প্রেমের উদ্বোধন ঘটিয়াছে, সেই উপবাসী হৃদয় আজ 'কাতর কাঙালে'র মতো প্রেমপাত্রের সন্ধানে রত। কিন্তু জয়সিংহ মন্দিরে ছিল না, ছিলেন রঘুপতি। তিনি আসিয়া অপর্ণাকে দেখিয়াই রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন ঐ 'মায়াবিনী' জয়সিংহকে তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। তাই তিনি অপর্ণাকে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। অপর্ণা চলিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র দৃশ্যটি তেমন তাৎপর্যপূর্ণ না হইলেও, ইহার মধ্যে আমরা একটি নাটকীয় ইঙ্গিত দেখিতে পাই। বৃহত্তর প্রেমের আহ্বান যে জয়সিংহকে রঘুপতির নিকট হইতে সত্যই একদিন কাড়িয়া লইবে—ইহার অস্ফুট আভাস রহিয়াছে দৃশ্যটিতে।

তৃতীয় দৃশ্যের স্থান মন্দির-সম্মুখস্থ পথ। জয়সিংহ সেখানে চিন্তামগ্ন। এই চিন্তাজাল তাহাকে এমনি পীড়িত ও ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে যে, সেই সন্দেহ-দোলা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য জয়সিংহ ব্যাকুল। সে যেন আর চিন্তা করিতে পারিতেছে না। পাপপুণ্য সত্যাসত্য ধর্মাধর্মের প্রভেদ-বিচারে সে ক্লান্ত। তাই এতকাল সে যাহা নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে, সেই গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করিতেই সে সংকল্পবদ্ধ হইল। হত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, রাজহত্যা কিছুই পাপ নহে, ইহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু প্রেমের স্পর্শে যাহার অন্তরে হিতাহিত চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ উদ্বোধিত হইয়াছে, তাহার কি অত সহজে নিষ্কৃতি আছে? মুক্ত বিশ্ব যে আজ তাহাকে আনন্দের মধ্যে আহ্বান করিতেছে, সেই উদার ছন্দে যোগ দিবার জন্যও যে মন তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। তাই যখন অপর্ণা আসিয়া

উপস্থিত হইল, তখন তাহার 'প্রেমের প্রভাবেই আকৃষ্ট হইয়া' অপর্ণাকে বলিল—

আয় সখি,
চিরদিন চলে' যাই দুই জনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে—শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম।

ঠিক এমনি সময়ে রঘুপতি আসিয়া জয়সিংহকে ডাকিলেন। জয়সিংহ তখন স্পষ্টই বলিল, "তোমারে চিনি নে আমি!" বৃহত্তর মানবধর্মের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে জয়সিংহ সংকীর্ণ প্রথাধর্মকে যেন ইহা দ্বারা অস্বীকাব করিতে চাহিল। সংস্কারের আহ্বান যেন তাহার চিত্তে আর সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। সে জানাইয়া দিল যে, সে তাহার ভিখারিণী সখীকে সঙ্গে লইয়া—ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া প্রেমের সহজ সরল পথেই চলিয়া যাইবে। সুতরাং 'কী কাজ শাস্ত্রের বিধি, কী কাজ গুরুতে!' কিন্তু দুর্বলচিত্ত জয়সিংহের মনে এই বিদ্রোহের ভাব বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। সে আবার পুরাতন পরিচিত জগতে ফিরিয়া আসিল। ছুরিকা বাহির করিয়া গুরুকে জানাইল যে, গুরুর আদেশ সে ভুলে নাই; যদি আরো কিছু আদেশ থাকে, উহা পালনেও সে প্রস্তুত। রঘুপতি বুঝিতে পারিতেছিলেন, অপর্ণাই উদারতর ধর্ম রূপে জয়সিংহকে তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। কিন্তু সংকীর্ণ ধর্ম তাহা হইতে দিবে কেন? তাই রঘুপতি আদেশ করিলেন, 'দূর ক'রে দেও ওই বালিকারে মন্দির হইতে।' নির্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল, সুকোমল, বেদনাকাতর, একটি প্রাণকে ব্যথা দিতে জয়সিংহের বাধিতেছিল, কিন্তু সেই মনোভাবের উপর গুরু-আজ্ঞাই জয়ী হইল। সে বলিল, 'তাই দিব গুরুদেব।'

অপর্ণাকে সে চলিয়া যাইতে বলিল, কারণ 'দয়ামায়া স্নেহপ্রেম সব মিছে।' এমন কি, অপর্ণাকে সে মরিয়া যাইতেও বলিল, কারণ দয়ামায়া মিথ্যা হইলেও মৃত্যু ধ্রুব সত্য। অপর্ণা জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু হায়, জয়সিংহের পক্ষে যে তাহা সম্ভবপর নয়। কারণ, সে যে 'সত্য-কারাগারে' বন্দী। কিন্তু অপর্ণাও মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিল না। তখন জয়সিংহ বলিল, সে যদি না যায় তবে জয়সিংহই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। নিরুপায় অপর্ণা তখন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রঘুপতিকে অভিশাপ দিয়া গেল—'এ বন্ধনে জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।' অপর্ণার এই উক্তি নাটকের দিক হইতে একটি মূল্যবান ইঙ্গিত। প্রথার উপর প্রেম যে চিরকাল জয়ী হয়—'বিসর্জন' নাটকের ইহাই ভাববস্তু। অপর্ণা প্রেমের প্রতীক, রঘুপতি প্রথার। অপর্ণার কথায় প্রেমের জয়ী হইবার অনিবার্যতা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি নাটকের পরিণামে জয়সিংহকে যে রঘুপতির হারাইতে হইবে, এই প্রধানতম ট্র্যাজিক ঘটনার আভাসও রহিয়াছে। দৃশ্যটির প্রধান তাৎপর্য এইখানে।

অপর্ণা চলিয়া গেলে রঘুপতি স্নেহবাক্যে জয়সিংহকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। জয়সিংহকে তাঁহার নিকট হইতে কেহ কাড়িয়া লইবে, এই ভাবনা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। কারণ, জয়সিংহকে সত্যই তিনি প্রাণাধিক স্নেহ করেন। কিন্তু রঘুপতির স্নেহবাক্য জয়সিংহকে কোনো আশ্বাসই দিতে পারিল না। কারণ, অপর্ণার প্রেম তাঁহাকে অধিকতর আশ্বাস দিয়াছে; অনেক বেশি বিচলিত করিয়াছে। তাই সে বলিল, রঘুপতি যেন স্নেহের কথা আর না বলেন। তাঁহার সঙ্গে জয়সিংহের কেবল কর্তব্যের সম্পর্ক, সেই কর্তব্যই জয়সিংহের

মনে জাগরূক থাকুক—'শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ'-এর মতো কর্তব্য। কিছুতেই জয়সিংহের মন যে কেন পাইতেছেন না, রঘুপতি তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার সংলাপের ভিতর দিয়া চতুর্থ দৃশ্যের আরম্ভ। সংস্কারান্ধ জনতার দৃঢ় বিশ্বাস, রাজ্যে যত কিছু অমঙ্গল ঘটিতেছে, সকলের মূলেই রহিয়াছে রাজার বিধর্মীসুলভ বলি বন্ধের আদেশ। তাহাদের কথাবার্তায় বুঝা যাইতেছে, রাজার উপর তাহারা অসন্তুষ্ট।

জনতা প্রস্থান করিলে চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্য সেখানে প্রবেশ করিলেন। চাঁদপাল রাজাকে জানাইলেন, রঘুপতি ও নক্ষত্র রায় দুইজনে মিলিয়া রাজকে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছেন এবং উহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। রাজভ্রাতা দেবীর সম্মুখে রাজরক্ত আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত। শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য শুধু বলিলেন, তবে আর নক্ষত্রের কী দোষ? 'জানিয়াছি, দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।' চাঁদপাল চলিয়া গেলে গোবিন্দ-মাণিক্যের মনে হইল, তাঁহার 'শির লক্ষ্য' করিয়া 'এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক হতে', উহার মূল যেন স্বয়ং তিনি; অতএব তাঁহার মৃত্যুতে যদি সকল অশান্তির অবসান হয়, তাহাই হোক। এমন সময় জয়সিংহ সেখানে প্রবেশ করিয়া দেবী প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই তিনি রাজরক্ত চাহেন কি না। রঘুপতি প্রতিমার আড়ালে থাকিয়া দেবীর প্রত্যাদেশের ছল করিয়া নিজেই ঘোষণা করিলেন—'চাই'। জয়সিংহ উহাকে সত্যই দেবীর আদেশ ভাবিয়া গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে বুঝাইলেন যে, উহা দেবীর প্রত্যাদেশ নয়, রঘুপতির কণ্ঠস্বর। জয়সিংহ আর সন্দেহের পীড়ন সহ্য করিতে

পারিতেছিল না, শেষ একটা কিছু করিবার ব্যাকুলতায় বলিল, 'গুরু হোক, কিম্বা দেবী হোক, একই কথা।' এই বলিয়া সে ছুরিকা বাহির করিল, কিন্তু তাহার অন্তরের মনুষ্যত্ব তাহাকে রক্ত-পাতে বাধা দিল। দেবীর নিকট কাতরকণ্ঠে সে বলিল, ফুল লইয়াই যেন দেবী সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু আর রক্তপাত নয়।

গোবিন্দমাণিক্য চলিয়া গেলেন, প্রবেশ করিলেন রঘুপতি। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া সব পণ্ড করিয়া দিয়াছে বলিয়া তীব্র ভাষায় জয়সিংহকে তিনি ভর্ৎসনা করিলেন। পরে দেবীর চরণ স্পর্শ করাইয়া তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন—

> বল্ তবে, আমি এনে দিব রাজরক্ত
> শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

জয়সিংহ সেইরূপ প্রতিজ্ঞাই করিল। এইখানে দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি। ঘটনার তীব্রতা এখানে তীব্রতর হইয়াছে; শেষ পর্যন্ত কী হইবে, জয়সিংহের শপথ-বাক্য সেই কৌতূহল জাগ্রত করিয়া আমাদের মনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। এইখানেই দৃশ্যটির, তথা দ্বিতীয় অঙ্কেরও সার্থকতা।

তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভেই দেখা যায়, মন্দিরে সমবেত জনতাকে রঘুপতি বিদ্রোহের প্ররোচনা দিতেছেন। তিনি নিজে দেবী প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন, উহা দেখাইয়াই জনতাকে বুঝাইতে চাহিলেন, রাজার অনাচারেই দেবী বিমুখ হইয়াছেন। কিন্তু এইসব দেখিয়া জয়সিংহের মনে আবার সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। কারণ—সে স্পষ্টই দেখিতেছিল, রঘুপতির প্রতারণাই দেবীর সন্তোষ-অসন্তোষের নামে চালানো হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াও সদুত্তর পাইবার আগেই রঘুপতি জয়সিংহকে লইয়া মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর গোবিন্দমাণিক্য আসিলে

জনতা তাঁহার নিকট দেবীকে ফিরাইয়া আনিবার প্রার্থনা জানাইল। কারণ তাহাদের ধারণা, রাজা বলি বন্ধ করিয়াছেন বলিয়াই 'অভিমানে বিমুখ হয়েছে মাতা'; উহারই ফলে রাজ্যে 'আসিছে মড়ক, উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত।' রাজা তাহাদের বুঝাইতে চাহিলেন, 'জীবনজননীর পূজা জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে। হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল।' কিন্তু মূর্খ প্রজারা অতশত বুঝিল না, তাহারা সংস্কারান্ধ। এমন সময় অপর্ণা সেখানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মন্দিরে উঠিয়া প্রতিমার মুখ মন্দিরের দ্বারের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। জনতার কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বড় প্রমাণ, দেবী সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া তাহারা চলিয়া গেল, রাজাও গেলেন। রঘুপতি ও জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন। দ্বিধাজড়িতচিত্ত জয়সিংহ গুরুর মুখ হইতেই জানিতে চাহিল, প্রতিমার মুখ যে পিছন দিকে ফিরানো হইয়াছিল—উহা তাহারই কাজ কি না। রঘুপতি স্পষ্টতই স্বীকার করিলেন, উহা তাঁহারই কাজ, প্রতিমার মুখ তিনিই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। উহার কারণ, দেবতা অসন্তুষ্ট হইলেও প্রতিমার মুখে তাহার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। মূর্খ জনসাধারণ উহা বুঝে না বলিয়াই ঐরূপ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহারা 'চোখে চাহে দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়। মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।' জয়সিংহের মনে আবার সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, 'দেবী নাই প্রতিমার মাঝে, তবে কোথা আছে?' জয়সিংহের মনে সন্দেহকে গাঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই দৃশ্যটির সার্থকতা।

পরবর্তী দৃশ্যের স্থান প্রাসাদকক্ষ। চাঁদপাল আসিয়া রাজাকে জানাইল, প্রজারা ষড়যন্ত্র করিতেছে এই বলিয়া যে, তাহারা

আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য মোগল-সেনাপতির নিকট দূত পাঠাইবে। চাঁদপাল চলিয়া গেলে গুণবতী আসিলেন। সংকটকালে রাজা গুণবতীর প্রেমস্পর্শ প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না, গুণবতী রাজার সঙ্গে কোনো কথা না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। ইহার পর নক্ষত্র রায় প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, রঘুপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নক্ষত্র রায় তাঁহাকে হত্যার কৌশল আঁটিয়াছেন। তিনি সোজাসুজি কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া এবং নিজ তরবারি নক্ষত্রের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃরক্তপাত যদি নক্ষত্রের এতই কাম্য হইয়া থাকে, তবে তিনি তাঁহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিতেছেন। নক্ষত্র ঐ তরবারি গোবিন্দ-মাণিক্যের বুকে বিদ্ধ করুক। অভিভূত নক্ষত্র রায় রাজার ক্ষমা চাহিলেন, বলিলেন, 'রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা। রক্ষ মোরে তার কাছ হতে।' রাজা তাহাকে অভয় দান করিলেন। প্রজারা যে মোগল-সেনাপতির সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করিতেছে, এই নূতন ঘটনা জ্ঞাপনই প্রধানত দৃশ্যটির উদ্দেশ্য।

তৃতীয় দৃশ্যের স্থান অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। রাণী একাকিনী চিন্তামগ্না। তাঁহার রাণীত্বের ও নারীত্বের অহংকারে ঘা লাগিয়াছে বলিয়া তিনি আপন মনে আক্ষেপ করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, কিছুদিন কঠিন হইয়া থাকিলেই গোবিন্দমাণিক্য আপনি তাঁহার নিকট 'প্রেমের তৃষ্ণায়' ধরা দিতে আসিবেন, কিন্তু উহা হয় নাই। এমন সময় গোবিন্দমাণিক্যের পালিত বালক ধ্রুবকে রাজার কাছে যাইতে দেখিয়া গুণবতীর মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সন্তান থাকিলে সে রাজার স্নেহের যে-ভাগ পাইত, ঐ শিশু যেন তাহাতেই ভাগ বসাইয়াছে। এমন সময় দেখিলেন, নক্ষত্র সেখান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। গুণবতী তাঁহাকে

ডাকিতেই তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি রাজা নাহি হব।' রাণী বলিলেন, নাই বা হইলে রাজা, কিন্তু যুবরাজ তো তুমি? ভবিষ্যতে তোমারই মাথায় রাজমুকুট উঠিবে। অথচ একটি চোর যে সেই মুকুট চুরি করিতে উদ্যত, নক্ষত্রের কি উচিত নয় সেই চোরকে—সেই পথের কণ্টককে সরাইয়া দেওয়া? স্পষ্ট করিয়া এই প্রসঙ্গে ধ্রুবের নামও উচ্চারণ করিলেন। আরও বলিলেন—

অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে করো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেব—রোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

রাণী যাহা বুঝাইলেন, দুর্বলচিত্ত নক্ষত্র তাহাই বুঝিলেন। দৃশ্যটিতে নূতন একটি ঘটনার অবতারণা করিয়া পাঠক ও দর্শকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করা হইয়াছে, এই সূত্রেই দৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ দৃশ্যে মন্দির সোপানে বসিয়া জয়সিংহ আপন মনে চিন্তা করিতেছে। যে-প্রতিমাকে এতদিন সে সত্য বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, রঘুপতির কথায় আজ সেই প্রতিমাই যেন মিথ্যা জড়স্তূপ বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতেছে। এমন সময় অপর্ণা সেখানে আসিল। উদার সত্য যেভাবে মানুষের কাছে বারবার আসে, প্রেম যেভাবে আসে, অপর্ণা তেমনই আসিল। অপর্ণাকে তাড়াইয়া দিলেও সে ফিরিয়া ফিরিয়া জয়সিংহের কাছে আসে। জয়সিংহও উহা বুঝিতে পারে। অপর্ণা তাই বলে, জয়সিংহ, তুমি যদি বুঝিতে পারিয়াছ যে, 'দেবী নাই', 'তবে এস এ মন্দির ছেড়ে।' কিন্তু জয়সিংহ যে কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধা। সেই বন্ধন তো সহজে ছিন্ন

করা যায় না। তাই সে বলিল, যাইব! তবে যে-রাজত্বে বাস করিতেছি, তাহার রাজকর পরিশোধ করিয়া তবে যাইব।—গুরুর কাছে সে শপথ করিয়াছে, সেই শপথের কথাই তাহার মনে পড়িল। সেই শপথ পালন না করিবার আগে তো তাহার মুক্তি নাই।

দৃশ্যটিতে জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দাহ দেখানো হইয়াছে। নাটকের জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। নাটকীয় ক্রিয়ার মধ্যে যে-চরিত্র ট্র্যাজেডিকে সার্থক করিবে, সেই চরিত্রের মধ্যে জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলে উহা ট্র্যাজিক-চরিত্র হইতে পারে না।

পঞ্চম দৃশ্যের স্থান মন্দির। সেখানে ধ্রুব নিদ্রিত। নক্ষত্র ও রঘুপতি তাহাকে মন্দিরে হত্যা করিতে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু হত্যা ব্যাপারে নক্ষত্র কিছুটা দ্বিধান্বিত, কিছুটা ভয়গ্রস্ত। তাই তিনি বলিলেন, 'আমি বলি আজ থাক্। কাল পূজা হবে।' রঘুপতি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, প্রহরিগণসহ রাজা আসিতেছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি খড়্গ উঠাইলেন, কিন্তু ধ্রুবকে হত্যার পূর্বেই রাজার নির্দেশে প্রহরিগণ কর্তৃক রঘুপতি ও নক্ষত্র বন্দী হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন—'নিয়ে যাও কারাগারে। বিচার হইবে।'

এইখানে তৃতীয় অঙ্ক সমা । তৃতীয় অঙ্কে নাটক climax-এ উঠে। এখানেও দুই প্রধান শক্তির সংঘর্ষ প্রত্যক্ষভাবে চরমে পৌঁছিয়াছে। দৃশ্যটির মধ্যে ক্রিয়ার দ্রুতি যেমন লক্ষণীয়, তেমনই একটি বুক-দুরুদুরু-করা ভাবের অস্তিত্বও অনুভবনীয়।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বিচার-সভা। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রশ্নের উত্তরে দর্পিত রঘুপতি উত্তর দিলেন, তিনি অপরাধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজার কাছে নয়, দেবীর কাছে। কারণ, মোহমুগ্ধ হইয়া তিনি অকারণে দেবীর পূজায় বিলম্ব করিয়াছিলেন, বলি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। রাজা তখন পূর্বঘোষিত আদেশ অনুসারে

রঘুপতির প্রতি আট বৎসর নির্বাসন দণ্ডের নির্দেশ দিলেন। রঘুপতি নতজানু হইয়া আবেদন জানাইলেন, শ্রাবণের শেষরাত্রি পর্যন্ত—মাত্র আর দুইটি দিনের জন্য—যেন এই দণ্ডাদেশ কার্যকর করা না হয়। 'শরতের প্রথম প্রত্যূষে'ই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, আর কোনোদিন এখানে ফিরিয়া আসিবেন না। রাজা সেই আবেদন মঞ্জুর করিলেন। রঘুপতি চলিয়া গেলেন।

ঘটনাটি পাঠক ও দর্শকের চিত্তে বেশ একটি নাটকীয় প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ, পাঠক ও দর্শক ইতিমধ্যে জানিয়াছেন যে—জয়সিংহ শ্রাবণের শেষ রাত্রে রাজরক্ত আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। রঘুপতি কি সেই রক্ত না দেখিয়া যাইতে পারেন? অধিকন্তু রাজার মৃত্যু হইলে, ঘটনার গতিই হয় তো অন্যদিকে মোড় ঘুরিবে, রঘুপতির প্রতাপ আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আশাও রঘুপতির মনে ছিল। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, তাহার প্রত্যাশায় পাঠক বা দর্শকচিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। দেখা যাইতেছে—নাটক যতই অগ্রসর হইতেছে, ঘটনার দ্রুতি ও চমৎকারিত্ব ততই বাড়িতেছে। সার্থক নাটকের ইহাই লক্ষণ।

রঘুপতির প্রস্থানের পর রাজা নক্ষত্র রায়কে দোষ স্বীকার করিতে আদেশ দিলেন। নক্ষত্র রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু কাহার প্ররোচনায় তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন না, সকল অপরাধ নিজের কাঁধেই তুলিয়া লইলেন। কিন্তু রাজা ন্যায়ের প্রতীক, ন্যায়ের শৃঙ্খলে তিনি বন্দী, সুতরাং অপরাধীকে—তিনি নিজের ভাই-ই হোন না কেন—ক্ষমা করিবার অধিকার তাঁহার কোথায়? তিনি আদেশ দিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে রাজার

তীর্থস্নানের জন্য যে রাজগৃহ আছে, নক্ষত্র রায় সেইখানে আট বৎসর নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করিবেন। ইহার পর গোবিন্দমাণিক্য সকল সভাসদকেই সভা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। এমন সময় পদচ্যুত প্রাক্তন সেনাপতি নয়ন রায় সেখানে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন, তিনি বিশ্বস্তসূত্রেই জানিতে পারিয়াছেন,—চাদপাল মোগল-সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ রাজাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল, তিনি নয়ন রায়ের উপরেই পুনরায় সৈন্যভার অর্পণ করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য মন্দির প্রাঙ্গণ—রঘুপতি ও জয়সিংহ আলাপরত। ব্রাহ্মণত্বের অহংকার খর্ব হইয়াছে বলিয়া রঘুপতির অন্তরে ক্ষোভের অন্ত নাই। অব্রাহ্মণের কাছে তাহাকে নতজানু হইতে হইয়াছে, এই চিন্তা তাঁহাকে মর্মপীড়ায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। জয়সিংহের কাছে তাই তিনি—গুরুরূপে আদেশ দিয়া নয়—স্নেহকাতর পালকরূপে ভিক্ষা চাহিলেন, জয়সিংহ যেন রঘুপতির কথা রাখে। রঘুপতির কাতর অনুনয় জয়সিংহকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে বলিল—

রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব।

এই বলিয়া জয়সিংহ চলিয়া গেল। জয়সিংহের উক্তি রঘুপতিকে অভিমানক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। হায়, গুরু নহেন,—দেবী চাহেন বলিয়াই জয়সিংহ দেবীর আদেশ পালন করিবে! দেবী জয়সিংহের কতখানি করিয়াছেন? রঘুপতির মতো তিনি কি তাহাকে পালন বা সেবা করিয়াছেন? জয়সিংহের অকৃতজ্ঞতা তাঁহার বুকে শেলের

মতো বাজিল। রাজরক্ত অনিয়া দিবার কথা জয়সিংহকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিবার মধ্যেই দৃশ্যটির গুরুত্ব। এখানে রঘুপতির হৃদয়ের কোমল দিকটিকে আরও প্রস্ফুটিত করার দিকটাও লক্ষণীয়। রঘুপতি যতই ঘা খাইতেছেন, তাঁহার স্নেহবৃত্তি যেন ততই উপলখণ্ডের বাধা অপসৃত করিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে চাহিতেছে।

এই অঙ্কের তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যে ঘটনাস্রোত আরও দ্রুত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। প্রাসাদকক্ষে রাজার নিকট নয়ন রায় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণকে তিনি ফিরাইয়া আনিয়াছেন। রাজা আদেশ দিলেই তিনি সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন। রাজা স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণের সংকল্প জানাইলেন। এমন সময় চর আসিয়া জানাইল, নক্ষত্র রায়কে নির্বাসনের পথ হইতে মোগলেরা কাড়িয়া লইয়াছে এবং তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছে। নক্ষত্র রায় এখন সসৈন্যে রাজধানীর দিকেই আসিতেছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরী বিপক্ষ শিবির হইতে নক্ষত্র রায়ের এক পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। নক্ষত্র জানাইয়াছেন, গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং এই নির্দেশ না মানিলে রক্তস্রোতে তিনি সোনার ত্রিপুরা ভাসাইয়া দিবেন। গোবিন্দমাণিক্য যেন এসব বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ভাই হইয়া নক্ষত্র এমন কাজ করিবেন, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত। তিনি বলিলেন, নক্ষত্র রাজা হইতে চাহিয়াছে—সে রাজা হোক, যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। ভাই যখন ভাইয়ের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তরবারি উদ্যত করিয়াছে, তখন যুদ্ধোদ্যম বৃথা। নক্ষত্রের নির্বাসনদণ্ড গোবিন্দ-মাণিক্য নতশিরে বহন করিবেন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান মন্দির। কাল—শ্রাবণের শেষ রাত্রি। বাহিরে ঝড় হইতেছে। রঘুপতি রাজরক্তের

প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া আছেন। অপর্ণা আসিল, রঘুপতি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পরেই প্রবেশ করিল জয়সিংহ। রঘুপতি প্রশ্ন করিলেন, 'রাজরক্ত কই?' জয়সিংহ বলিল, রাজরক্ত তাহার দেহেই রহিয়াছে। সে রাজপুত, তাহার পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন, সেই রক্তই সে দান করিবে। অতঃপর সে দেবীকে বলিল, কিন্তু

এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা। এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্তৃষাতুরা!

এই বলিয়া সে নিজের বুকে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিল। জয়সিংহের এই আত্মবলিতে রঘুপতি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এ কী সর্বনাশ করিল জয়সিংহ! জয়সিংহের আত্মদান তাঁহার চেতনাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল. নিজের অপূরণীয় ক্ষতির ভিতর দিয়া প্রাণের মূল্য তিনি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার স্নেহকাতর হৃদয় চিৎকার করিয়া উঠিল--

জয়সিংহ, বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব থাক! তুই আয়!

অপর্ণা আবার সেখানে জয়সিংহের সন্ধানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রঘুপতি বলিলেন—

আয়, মা অমৃতময়ি! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে..............................
.........ডাক্ জয়সিংহে। তুই তারে
নিয়ে যা' মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

জয়সিংহকে মৃত দেখিয়া অপর্ণা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। রঘুপতি প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া আর্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!" বস্তুত এই দৃশ্যটিই নাটকের Climax দৃশ্য, নাটকীয় ঘটনা এইখানেই চরমে পৌঁছিয়াছে। 'বিসর্জন'-এর সার্থকতা জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়াই সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। Climax-এর সঙ্গে, Fall বা ঘটনার দ্রুততার পতন এবং Catastrophe বা প্রত্যাশিত বিয়োগও ঘটিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। কারণ, বিরুদ্ধশক্তি রঘুপতির পতন এবং তাহার ভিতরকার ট্র্যাজেডিরও প্রকাশ এখানে হইয়াছে।

তথাপি, গোবিন্দমাণিক্যের কথা কিছুটা বাকি থাকিয়া যায় এবং 'বিসর্জন'-এ যে প্রেমকে হিংসার উপর জয়ী করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও অনুদ্‌ঘাটিত থাকে। এইজন্যই কবিকে পরে আরও কয়েকটি দৃশ্য সংযোজিত করিতে হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু নাট্যকার-উদ্দিষ্ট Idea-র জয় প্রকট হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্য প্রাসাদে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। এখনও তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন নাই, সিংহাসন ছাড়েন নাই; অথচ এখনই পৌরগণ আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইয়াছে? তিনি কি প্রজাদের কোনো মঙ্গলই করেন নাই? গুণবতী আসিয়া বলিলেন—আর কেন, এখনও রাজা যথাবিধি দেবীর পূজা করুন। কিন্তু রাজা উহাতে রাজী নন, হিংসার প্রশ্রয় তিনি কিছুতেই দিবেন না। রাণী চলিয়া গেলেন। ব্যথাহত গোবিন্দমাণিক্য চিরপরিচিত পুণ্য প্রাসাদের নিকট চিরবিদায় লইয়া অনিশ্চিতের উদ্দেশে পা বাড়াইলেন।

তৃতীয় দৃশ্যটি নাটকের ক্ষুদ্রতম দৃশ্য—গুণবতীর একটিমাত্র

সংলাপেই উহা নিঃশেষিত। তিনি সমস্ত আভরণের বিনিময়ে দেবী-পূজার আয়োজন করিতেছেন, ইহা জানানোই দৃশ্যটির উদ্দেশ্য। মনে হয়, ইহার জন্য একটি দৃশ্যের অবতারণা না করিলেও চলিত, অন্য উপায়েও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত।

চতুর্থ দৃশ্যটিই নাটকের শেষ দৃশ্য। স্থান মন্দির। রঘুপতি তখনও দেবী-প্রতিমার নিকট আকূতি জানাইতেছেন—'দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর।' কিন্তু কে জয়সিংহকে ফিরাইয়া দিবে? প্রতিমা তো পাষাণ মাত্র, 'মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির।' রঘুপতি এই সত্য এতদিনে বুঝিতে পারিলেন, 'হৃদয়-দলনী পাষাণী'কে তাই তিনি গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

গুণবতী পূজা লইয়া মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, দেবী নাই। রঘুপতি তাঁহাকে বলিলেন, দেবী কোথাও নাই। যে-দেবী ছিল সে দেবী নয়, পিশাচী।--

> পুণ্য রক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
> ফেটে মরে গেছে।

রঘুপতির কথাতেই রাণী দেবীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখেই জানিতে পারিলেন, দেবী নাই —দেবীর নামে মিথ্যাই এতদিন আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল। তখন রাজার প্রেমের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এদিকে অপর্ণা মূর্ছাভঙ্গে উঠিয়া রঘুপতিকে স্নেহকণ্ঠে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিল। রঘুপতির দুঃখ আজ তাহাকে সত্যই দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে। রঘুপতিও অপর্ণার কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন শুনিয়া পুনরায় স্নেহের আস্বাদ পাইলেন, এবং অপর্ণার মধ্যে তাঁহার হারানো স্নেহপাত্র জয়সিংহকে খুঁজিয়া পাইলেন।

রাজা পুষ্পার্ঘ্য লইয়া দেবীকে শেষ পূজা দিতে আসিয়া

মৃত জয়সিংহকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রঘুপতি বলিলেন, 'এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ মন্দিরে।' রাজা জয়সিংহের উদ্দেশেই পূজার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। রাণী গুণবতীও এতদিনে মোহমুক্ত হইয়াছেন। তিনি আসিয়া রাজাকে কহিলেন, 'আজ দেবী নাই—তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।' ইহার পর অপর্ণা যখন রঘুপতিকে 'পিতা, চলে এস' বলিয়া আহ্বান জানাইল, তখন রঘুপতির নবলব্ধ অনুভূতিও বলিয়া উঠিল—

পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!

"এইখানে বিসর্জন সম্পূর্ণ হইল—মিথ্যা দেবীপ্রতিমার বিসর্জন হইল, জয়সিংহের ন্যায় মহাপ্রাণের বিসর্জন হইল, রঘুপতির ন্যায় বলিষ্ঠ উন্নত হৃদয় হইতে কুসংস্কার ও হিংসার বিসর্জন হইল, রাণীর ভ্রমের বিসর্জন হইল, রাজা ও রাণীর মধ্যেকার বিদ্রোহের বিসর্জন হইল।" রবি-রশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বিসর্জন' নাটকের মূল ভাবটি কি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল—তার চৈতন্য হলো, বোঝবার বাধা দূর হলো, প্রেম হলো জয়যুক্ত।

'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে আইডিয়াকে জয়ী করিতে চাহিয়াছেন, উহা সর্বপ্রসারী প্রেম। নাটকে প্রেমের সঙ্গে ঠিক প্রতাপের দ্বন্দ্ব বাধে নাই। ঠিকমতো বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রেমের সঙ্গে প্রথার দ্বন্দ্বই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। রঘুপতির

ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপ অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের চিরাগত সংস্কার ছিল অধিকতর শক্তিশালী এবং সেই সংস্কারকে স্থায়ী করিবার প্রবল ইচ্ছাতেই তিনি এ নাটকে তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। রাণী গুণবতীকে তিনি প্ররোচিত করিয়াছেন, নক্ষত্র রায়কে প্ররোচিত করিয়াছেন, প্রজাসাধারণকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন—সবই সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া—বলি বন্ধ হইলে দেবী রুষ্ট হইবেন, রাজ্যের অমঙ্গল হইবে ইত্যাদি তথাকথিত যুক্তি দেখাইয়া। অবশ্য পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার শেষদিকে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন—

একদল লোক বাহুশক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন করে রাখতে চায়—অন্যদল বলছে প্রেমই সব চেয়ে বড় জিনিস। জয়সিংহ এই দোটানার মাঝখানে পড়ল এবং কোনটা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বস্তুত 'বিসর্জন' নাটক অর্থহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে প্রেমশক্তির সংগ্রামই মুখর হইয়া আছে। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরাম ঘটে নাই। প্রেম-শক্তিই 'বিসর্জন' নাটকের সকল ঘটনার নিয়ন্তা, সকল বিরোধের অবসানকারক। বৃত্তের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুর মতো প্রেম এ নাটকে স্থির ও অচঞ্চল।

নাটকে এই দ্বন্দ্বের একদিকে রহিয়াছেন রাজা গোবিন্দমাণিক্য, অপরদিকে রাজপুরোহিত রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য নিত্য মানব-ধর্ম, উদার মনুষ্যত্ব, সহজাত প্রেমের ও অহিংসার প্রতীক। রঘুপতি অর্থহীন ধর্ম, যুক্তিহীন প্রথা, মনুষ্যরচিত আচারবিধি ও হিংসার প্রতীক। প্রথম পক্ষের শক্তিকে প্রাণরস যোগাইয়াছে চিরন্তন সত্য ও প্রেমের প্রতিমূর্তি অপর্ণা ; দ্বিতীয় পক্ষের শক্তি যোগাইয়াছে রাণী

গুণবতীর অবোধ সন্তান-কামনা, অল্পবুদ্ধি নক্ষত্র রায়ের রাজ্যলোভ এবং গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসমান সংস্কারচালিত প্রজাসাধারণ। দুই বিরুদ্ধশক্তির মাঝখানে জয়সিংহ কেবলই সন্দেহ-দোলায় দুলিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত উহার নিরসন করিতে না পারিয়া দ্বন্দ্বের মূলে আত্মবিসর্জন দিয়া মিথ্যা ধর্মবোধকে সচেতন করিয়াছে, রক্তস্রোতের মধ্যে অমৃতপ্রবাহ আনিয়া দিয়াছে।

প্রেমের শক্তি-যে কত বড়, কত অপরাজেয় তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ অপর্ণা। সে এক ভিখারিণী বালিকা, ঐহিক ঐশ্বর্যও তাহার কিছু নাই; অথচ তাহার কণ্ঠে করুণার যে-বাণী উচ্চারিত হয়, উহার প্রভাবে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য অভিভূত হন এবং হিংসার অসারতা ও প্রেমের দুর্জয় প্রভাব অন্তরে অনুভব করিতে পারেন। মিথ্যা প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টি উন্মোচিত হয় এবং তিনি মন্দিরে চিরাগত বলির প্রথা বন্ধের আদেশ দানে বদ্ধপরিকর হন। যাহারা সংস্কারান্ধ তাহারা এই উদার প্রেমকে বড় ভয় করে, তাই রঘুপতি অপর্ণাকে ভয় করেন। তিনি বুঝিতে পারেন, প্রথার অচলায়তনে অপর্ণা ছোট্ট একটি প্রাণবন্ত অশ্বত্থতরুর মতো—বিদ্রোহের জীবন্ত প্রতীক—উহা যে-কোনোদিন সেই অচলায়তনকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিতে পারে। অথচ, প্রথা গেলে সনাতনতার সম্বল আর কিছুই থাকে না। তাই অপর্ণা যখন জয়সিংহকে বারেবারে ডাকিতে আসে, রঘুপতি তখন বারেবারেই তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন। জয়সিংহকে সযত্নে প্রেমের প্রভাব হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে চান। চিরাগত 'বৃদ্ধ প্রথা' এমনিভাবেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চায়। রঘুপতি ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে বিদ্রোহী করিয়া, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর মনকে বিষাক্ত করিয়া, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া আপনার

মতকে - তথা মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধসংস্কারকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেমের কাছে রঘুপতির পরাজয় ঘটিয়াছে। উহার জন্য তাঁহাকে কঠিন মূল্য দিতে হইয়াছে—প্রাণাধিক জয়সিংহকে হারাইতে হইয়াছে।

সংস্কারবদ্ধ মানুষ যে সহজে সত্যকে বুঝিতে পারে না, জয়সিংহের মধ্যে উহার প্রকাশ দেখিতে পাই। জয়সিংহ রঘুপতির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াও 'রাজরক্ত চাই' বাক্য দেবীর বাণী বলিয়া ভুল করিয়াছিল। মোহাচ্ছন্ন বলিয়াই জয়সিংহ সাহস করিয়া প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তাহাকে আত্মবলি দিতে হইয়াছিল।

এইবার 'বিসর্জন' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

বিসর্জন—এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে? আমরা দেখতে পাই যে, নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা-বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর-এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।

সুতরাং, প্রতিমা-বিসর্জন এই নাটকের শেষ কথা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হলো জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ, তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে, প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝতে পারল যে, সে যা হারালো তা কত মূল্যবান। ছাগশিশুর প্রাণ কত সত্য জিনিস সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল, কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝতে সময় লেগেছিল—সে প্রিয়জনকে

নিদারুণভাবে হারিয়ে তারপর অনুভব করতে পারল যে, প্রাণের মূল্য কত বেশী, তাকে আঘাত করলে তার মধ্যে কত বেদনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া দুইটি মাত্র বিসর্জনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—দেবী-প্রতিমার বিসর্জন ও জয়সিংহের আত্মবিসর্জন। কিন্তু 'বিসর্জন'-এ আরও বিসর্জনের কথা আছে। এই নাটকের আরও কয়েকটি চরিত্রকে নানা ঘটনাবর্তে পড়িয়া, নানা জটিল সংঘাতের সম্মুখীন হইয়া কিছু না কিছু বিসর্জন দিতে হইয়াছে। গুণবতী চাহিয়াছিলেন সন্তান। উহার জন্য তিনি যত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সকলই করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তানলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহাকে তাঁহার সন্তান-কামনা বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। অবশ্য উহার সঙ্গে আরও একটি বিসর্জন ঘটিয়াছে। এই সন্তান-কামনার উদগ্রতায় তাঁহার ও রাজার মধ্যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাণী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। নাটকের শেষে রাণী তাঁহার নিদারুণ ভ্রমকে বিসর্জন দিয়াছিলেন, স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ দেবী নাই—তুমি মোর একমাত্র রয়েছে দেবতা।" কর্তব্যপালনে গোবিন্দমাণিক্যকেও বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, নানা দিক হইতে নানা আঘাতে তাঁহার মন ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর নিকট প্রেমের প্রত্যাশী হইয়া বারবার তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। স্ত্রীর বিমুখতা তাঁহার কর্তব্যকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। ভাইয়ের নিকট হইতে তিনি চরম আঘাত পাইয়াছেন এবং উহা অসহনীয় হওয়ার ফলে তিনি রাজত্ব-ভোগকে বিসর্জন দিয়াছেন। সবচেয়ে বড় বিসর্জন দিতে হইয়াছে রঘুপতিকে। 'জীবন-মন্থন-করা-ধন'কে হারাইয়া তাঁহার আজন্ম সংস্কারের ভিত্তিমূল ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দেবী প্রতিমার উপর তাঁহার

যে অটল ভক্তি ও অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই ভক্তি ও বিশ্বাসকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। ফলে হিংস্র-হিংসা ও সংস্কারের উন্মত্ততার বিসর্জন ঘটিয়াছে।

যে-নাটকের পরিণাম বিষাদান্ত হইয়া থাকে, সাধারণভাবে তাহাকেই Tragedy বলা হইয়া থাকে। এই বিষাদ মৃত্যুর জন্যও হইতে পারে, আবার জীবনের ব্যর্থতার জন্যও হইতে পারে। ট্র্যাজেডির মৌল লক্ষণ দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলিতে বুঝিতে হইবে—দুইটি পক্ষ আছে, সেই দুই পক্ষের একটির সহিত অন্যটির বিরোধ বর্তমান। এই বিরোধের বা সংঘর্ষের নামই দ্বন্দ্ব। উহা কেবল বাহ্য আবেষ্টনীর সহিত দন্দ্ব বুঝায় না, প্রবৃত্তি বা আদর্শের পারস্পরিক দ্বন্দ্বও বুঝায়।

Conflict of feelings, modes of thought, desires, wills, purposes, conflict of persons with one another or with circumstances or with themselves, one several or all of these kinds of conflict as the case may be.

ট্র্যাজেডির উৎস পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। সুতরাং উহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, সেই সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। আবার ইহাও সত্য, পাশ্চাত্ত্যেও ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। অন্ধ নিয়তি-পরিচালিত ভাগ্যবিপর্যয় এবং দুর্বিপাক ছিল প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির বিষয়। মধ্যযুগে, অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়রের সময়ে 'চরিত্রই নিয়তি'-নীতি দ্বারা ট্র্যাজেডী পরিচালিত হইত। অর্থাৎ, নানাগুণে ভূষিত ট্র্যাজিক-চরিত্রের মধ্যে একটা না একটা দুর্বলতা থাকিত, আর সেই ছিদ্রপথেই তাহার জীবনে নামিয়া আসিত করুণ ট্র্যাজেডি। ঐ দুই যুগেই—প্রাচীন ও মধ্যযুগে ট্র্যাজেডির সমাপ্তি ঘটিত এক বা একাধিক প্রধান

চরিত্রের মৃত্যুতে। কিন্তু পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডির রূপ জটিলতর হইয়াছে। বর্তমানকালের ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু অপরিহার্য নয়, চারিত্রিক সূক্ষ্ম বেদনার প্রতিক্রিয়ায়—অথবা কোনো বিচ্ছেদেও ট্র্যাজেডি হইতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির অপূর্ণতা মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জীবন তাহার নিকট ভারস্বরূপ ও দুঃসহ হইয়া উঠে এবং এইরূপেও ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয় বলিয়া বর্তমান-কালের ধারণা। আবার অনেকের মতে—কোনো ব্যক্তির অসাসাধারণত্ব হইতেও আধুনিক ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো বিশেষ ব্যক্তি চারিত্রবলে বা আদর্শে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র এবং ঐ স্বাতন্ত্র্যই সাধারণের সঙ্গে বিরোধ ঘটাইয়া তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলে। ফলে সৃষ্টি হয় ট্র্যাজেডির। ইবসেনের 'An Enemy Of The People' এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্র-নাটকের ট্র্যাজেডির বিশেষত্ব হইল এই যে, যদিচ তিনি প্রধানত শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতি ও ট্র্যাজেডিকেই অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি একান্তভাবে উহাকেই তিনি অবলম্বন করিয়া থাকেন নাই। একই নাটকের বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে ট্র্যাজেডির বিভিন্ন আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাঁহার নাটকে। আমাদের আলোচ্য 'বিসর্জন' নাটকই উহার উদাহরণ। উহার প্রধান চারিটি চরিত্র কোনও এক যুগের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার মধ্যে বিকশিত হয় নাই--বিভিন্ন স্বরূপে বিভিন্নভাবে বিকশিত হইয়াছে।

গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রধান লক্ষণ--অর্থাৎ, অদৃষ্ট-তাড়নায় ভাগ্য-বিপর্যয়ের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় রাণী গুণবতীর চরিত্রে। এখানে শুধু গ্রীক ট্র্যাজেডির মৃত্যু-পরিণতিটিই অনুপস্থিত। রাণী গুণবতীর ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, তবু তিনি সন্তানবতী ভিখারিণীর চেয়েও

দরিদ্রা। কারণ, অদৃষ্ট তাঁহাকে পুত্রবতী করে নাই। সন্তান-কামনাতুরা রাণী তাই ত্রিপুরেশ্বরীর নিকট মানত করিলেন, মা যদি তাঁহাকে সন্তান দেন, তবে প্রতি-বৎসর তিনি দেবীর উদ্দেশে একশত মহিষ ও তিনশত ছাগ বলি দিবেন। সন্তানের আশা করিয়া তিনি আগেই মন্দিরে বলির পশু পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার সেই সাধেও বাদ সাধিল। কারণ, রাজাজ্ঞায় তখন মন্দিরে বলিদান নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নিজের স্বামীই তাঁহার কামনার পথে অন্তরায় জানিয়া গুণবতী ক্ষুব্ধ ও অভিমানাহত হইলেন। স্বামী গোবিন্দমাণিক্যকে অনুরোধ জানাইলেন, ঐরূপ আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য কিছুতেই উহাতে রাজী হইলেন না। গুণবতীর রাণীত্ব-গর্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। উহার প্রতিক্রিয়ায় তিনি হিংস্র হইয়া উঠিলেন। রাজাকে প্রত্যা-ঘাত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজার পালিত-পুত্র বালক ধ্রুবকেই মন্দিরে বলি দিবার সংকল্প করিলেন। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে প্ররোচিত করিয়া তিনি ধ্রুবকে অপহরণ করাইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট এইবারেও গুণবতীর প্রতি বিমুখ হইল। বলির মুহূর্তে গোবিন্দ-মাণিক্য সপ্রহরী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অপরাধী নক্ষত্র ও রাজ-পুরোহিত রঘুপতিকে বন্দী করিলেন। কিছুদিন পরে অদৃষ্ট আবার যেন তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিল। ঘটনাচক্রে গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নির্বাসনে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা নাই, অতএব মন্দিরে বলিদান নিষেধের রাজজ্ঞাও অর্থহীন। এই সুযোগে গুণবতী আপনার অলঙ্কারসমূহের বিনিময়ে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উল্লসিত হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন পূজা দিতে। কিন্তু হায়, অদৃষ্ট এবারেও তাঁহাকে বঞ্চনা করিল। দেবীই মন্দিরে নাই, রঘুপতি ইতিপূর্বেই দেবীমূর্তি

গোমতী-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এইভাবেই গুণবতীর জীবনে নামিয়া আসিয়াছে ট্র্যাজেডির সকরুণ বিষণ্ণতা। মরীচিকার মতো অদৃষ্ট বারবার তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, আর বিভ্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত করিয়াছে।

রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে যে ট্র্যাজেডি দেখা যায়, উহা অনেকটা ইবসেনীয় ট্র্যাজেডির মতো। চরিত্রের অ-সাধারণত্বই এখানে ট্র্যাজেডির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য এক দৃঢ়চরিত্র পুরুষ; আদর্শে অবিচলিত, কর্তব্যপালনে অটল। তিনি প্রেমের মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া চিরাগত হিংস্র প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, মন্দিরে বলি নিষিদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী, ভ্রাতা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপুরোহিত, সেনাপতি—এমন কি রাজ্যের প্রজাবৃন্দ পর্যন্ত সেই আদর্শকে নীরবে মানিয়া লইতে পারিলেন না, সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। প্রথম আঘাত আসিল রাজপুরোহিত রঘুপতির নিকট হইতে। রঘুপতি নানারূপ চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়া রাজার জীবনকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি পর্যন্ত তথাকথিত ধর্মদ্বেষী হইতে অস্বীকৃত হইয়া পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজার কর্তব্য আরও কঠিন হইয়া উঠিল, যখন রাণী গুণবতীও তাঁহার আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাঁহার প্রতি রূঢ় ও কঠোর হইয়া উঠিলেন। যে-ভাইকে তিনি প্রাণের চেয়েও স্নেহ করিতেন, সেই নক্ষত্র রায় পর্যন্ত যখন রঘুপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বাস করিবার, দাঁড়াইবার কিছুই যেন আর রাজার রহিল না। তথাপি তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন না। ঝড়ের মুখে অতিকায় মহীরুহের মতো সংকল্প ও আদর্শে স্থির দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে রাজ্যের প্রজারাও যখন

বিদ্রোহী হইল এবং মোগল সৈন্য লইয়া নক্ষত্র রায় ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন তিনি যেন ভাঙিয়া পড়িলেন। বৃথা রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য নিজেই সিংহাসন ছাড়িয়া নির্বাসন-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। ইহা সত্যই ট্র্যাজিক ব্যাপার। গোবিন্দ-মাণিক্য চাহিয়াছিলেন সকল প্রাণীর কল্যাণ। বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া তাই তিনি বৃথা রক্তপাত বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মিথ্যা নির্বোধ কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন প্রেমধর্মসমুজ্জ্বল উদার মানবধর্মকে। কিন্তু তাঁহার আশেপাশের কেহই সেই মহত্ত্বের প্রতি সহানুভূতি তো জানাইলই না, বরং উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ইহাতে মহৎ প্রয়াসের বিনষ্টি ঘটিল এবং ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইল। রাজ্যত্যাগের পূর্বে গোবিন্দমাণিক্যের সখেদ স্বগতোক্তি, তাঁহার মর্মাহত মনেরই প্রকাশ। গোবিন্দমাণিক্য ছিলেন সাধারণের উর্ধ্বে, তাই সাধারণের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটিল এবং ফলে তাঁহাকে হার মানিতে হইল। এই পরাজয়ই ট্র্যাজেডি। ইবসেন এই ধরনের ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন তাঁহার "An Enemy Of The People"-এর ডঃ টমাস স্টকম্যানের চরিত্রে। স্টকম্যান চাহিয়াছিলেন জনকল্যাণ। কিন্তু যিনি ছিলেন সত্যকার জন-মিত্র, তিনিই শেষ পর্যন্ত তাঁহার বড় ভাই পিটার স্টকম্যানের ষড়যন্ত্রে সকলের কাছে প্রতিপন্ন হইলেন জন-শত্রু রূপে। উহা বিসর্জনের গোবিন্দ-মাণিক্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

রঘুপতি চরিত্রের ট্র্যাজেডি শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির অনুরূপ, অর্থাৎ সেই ট্র্যাজেডি চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা (inharent weakness of character) হইতে জাত। রঘুপতি এক সংকল্পদৃঢ় পুরুষ। সনাতন প্রথাকে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস

করেন, দেবীপূজাকে তিনি একমাত্র কর্তব্য বলিয়া জানেন। এই ধর্মসংস্কার তাঁহার নিশ্বাসবায়ুর মতো। সুতরাং উহার এতটুকু বিচ্যুতি তাঁহার পক্ষে অসহ্য। সেই সংস্কারে আঘাত লাগিলেই তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। সেখানে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যগর্ব প্রবল হইয়া উঠে। তাই রাজা যখন বলি বন্ধ করিলেন, রঘুপতি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত দিলেন ; পরে রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। আপনার ধর্মসংস্কার অটুট রাখিবার জন্য তিনি সব রকম ছল-বল-কৌশলই অবলম্বন করিলেন, নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিলেন। এমন কি, উহার জন্য মিথ্যাচার করিতেও তাঁহার বাধে নাই। মিথ্যাচারের সপক্ষেও তাঁহার যুক্তি 'সত্য তাই নাম ধরে মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা।' কিন্তু এই প্রচণ্ড আত্মাভিমানীর মধ্যেও একটি দুর্বল দিক ছিল, উহা জয়সিংহের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ। এই স্নেহের পাত্রটিকে হারাইবার কল্পনাও তিনি করিতে পারেন না। তাই অপর্ণা যখনই জয়সিংহকে ডাকিতে আসে, রঘুপতি তাহাকে দূর করিয়া করিয়া তাড়াইয়া দেন। সেই জয়সিংহই যখন সন্দেহপীড়িত হইয়া রঘুপতির স্নেহ প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল, তখন হইতেই রঘুপতির জীবনের ট্র্যাজেডির শুরু। জয়সিংহের এই অকৃতজ্ঞতাতে তাঁহাকে বারংবার খেদোক্তি করিতে দেখি। এই ট্র্যাজেডি চরমে উঠিল জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের পরেই। সংস্কারের বাঁধ ভাঙিয়া স্নেহের বন্যা তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিরাট শূন্যতার মধ্যে রঘুপতির মন হাহাকার করিয়া উঠিল। ইহাই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। গর্বিত রঘুপতি ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন ইহাই সার্থক ট্র্যাজিক দৃশ্য। সংস্কার অব্যাহত রাখিবার জন্য রঘুপতি চাহিয়াছিলেন গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যু, কিন্তু

মৃত্যু ঘটিল তাঁহার প্রাণাধিক জয়সিংহের। জয়সিংহকে তিনি হারাইলেন। এতদিন যে-দেবীপ্রতিমাকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল হইল। দেবীপ্রতিমা তাঁহার নিকট প্রস্তরস্তূপ ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ হইল না। স্নেহের দৌর্বল্য যদি না থাকিত, তবে রঘুপতির জীবনে এমন ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইত না।

অন্তরের দ্বন্দ্ব হইতে জীবনের প্রতি সকল আকর্ষণ হারাইয়া ফেলার মধ্যেই জয়সিংহ চরিত্রের ট্র্যাজেডি নিহিত। শৈশব হইতেই অনাথ জয়সিংহ রঘুপতির কাছে মানুষ। সে একমাত্র রঘুপতিকেই চিনে, আর চিনে ত্রিপুরেশ্বরীকে—রঘুপতিই তাহাকে চিনাইয়া দিয়াছেন সেই ত্রিপুরেশ্বরীকে। রঘুপতি এবং দেবী উভয়ের প্রতিই তাহার অটল বিশ্বাস। কিন্তু সেই বিশ্বাসের মূল প্রথম শিথিল হইতে আরম্ভ করিল অপর্ণার প্রেমময় স্পর্শে। তখন হইতে অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরু। দেবী-প্রতিমার প্রতি সন্দেহের ভিতর দিয়াই উহার প্রকাশ—'করুণায় কাঁদে প্রাণ মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর।' আবার একদিকে রঘুপতিও তাহাকে নূতন শিক্ষা দেন, অপর্ণা হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া রাখেন। তখন সে দেবীকেই সত্য বলিয়া মনে করে—প্রতিজ্ঞা করে, প্রাণ থাকিতে জননীর পূজা অসম্পূর্ণ থাকিতে দিবে না। একদিকে অপর্ণা, একদিকে রঘুপতি—এই দোটানায় পড়িয়া তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ক্রমে সে গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে জীবনের প্রতি আকর্ষণও। ক্রমে দেবীর উপর তাহার বিশ্বাসেও চিড় ধরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া সে বলে—

> এ কী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
> এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু—বিশ্ব মাঝে
> কিছু রহিল না আর।

এই সর্বরিক্ততার মধ্যে জীবনের সকল মূল্যবোধকেও সে হারাইয়া ফেলিল। সে আসিয়া দাঁড়াইল 'সত্যশূন্য, দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে'। এই শূন্যতার মধ্যে কোনো মমতাবোধই আর থাকে না, জীবনের প্রতিও নয়। এইখানেই জয়সিংহের ট্র্যাজেডি। পরে অবশ্য সে আত্মহত্যা করিয়াছে, তবে উহা একটা বাহ্য ক্রিয়া মাত্র। জয়সিংহ-চরিত্র যেন অনেকটা হ্যামলেট-চরিত্রের মতো—'to be or not to be'-র দ্বন্দ্বে সব সময় দোল খাইয়াছে।

কিন্তু চারিটি প্রধান চরিত্রের ট্র্যাজেডি সত্ত্বেও ভাব-পরিণতির দিক হইতে 'বিসর্জন'-এর 'ট্র্যাজেডি'ত্ব সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। জয়সিংহের আত্মবিসর্জন এবং রঘুপতির দীর্ণ হাহাকারের মহাশূন্যতার পরেও নাটকটিকে টানিয়া লওয়া যাওয়া হইয়াছে এবং শেষ দৃশ্যে একটি শান্তি-সমাধানের মধ্যে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। সেখানে সব হারাইয়াও পাওয়ার আনন্দ রহিয়াছে। রাজা ফিরিয়া পাইয়াছেন রাণীর প্রেম, রাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন প্রেমের যথার্থ মহিমা, এবং রঘুপতি লাভ করিয়াছেন সত্যধর্মের উদার দৃষ্টি। সুতরাং ট্র্যাজেডি কোথায়?

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু অপরিহার্য না হইলেও, উহার পরিণাম হয় দুঃখদায়ক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি নাটকে সাধারণত দেখা যায়, মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্যে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে না; ট্র্যাজেডির পরিণামে—পাপীর নয়, পাপের বিনাশ ঘটে এবং যে-চরিত্র আত্মোৎসর্গ করে, সেই চরিত্র নিষ্পাপ ও নির্দোষ। এমনিভাবে নিঃশেষে প্রাণ বলি দেওয়ার ফলে পাপীর হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এবং পাপ ও মোহমুক্ত হইয়া সেই চরিত্র জীবনের সত্যধর্ম উপলব্ধি করে। 'বিসর্জন'-এও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

নাটকের রস-পরিণাম শান্তিময় হইলেও যে উহা ট্র্যাজেডি হইতে পারে, পাশ্চাত্যের সমালোচকদের নিকট হইতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়—

A tragedy may permit of relief or even recovery for the good or it may minimise the external and physical elements of sufferings, but its actions must be largely unhappy though its end is not destructive and even if it does not lead to death.

'বিসর্জন'-এ অনেকটা এইরূপই হইয়াছে। এ নাটকের পরিণতি ঘটিয়াছে 'recovery for the good'-এর 'permission'-এ। এ বিষয়ে আমাদের দেশের একজন রসজ্ঞ সমালোচকের বক্তব্যও প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,

পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনা করিতে পারিলেও, সাহিত্য-সৃষ্টির দিক হইতে হয়ত তাহা সার্থক হইত না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, 'বিসর্জন' শুধু নাট্য নহে, শুধু অভিনয়ই উদ্দেশ্য নহে, তাহা কাব্যনাট্য; তাহার একটা কাব্যের দিক, সাহিত্যের দিক আছে। আর, শুধু নাটকের দিক হইতে দেখিলেও জয়সিংহের বিসর্জন-দৃশ্যের সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে নাটকের কলাকৌশল একটু ক্ষুণ্ণ হইত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে একটা বেদনাময় অস্থিরতার মধ্যে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিত; নাটকীয় কলাকৌশলের দিক হইতে তাহা হয়ত খুব ভালো হইত না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত তাহা চাহেন নাই—এবং চাহেন নাই বলিয়াই আখ্যান-বস্তুটিকে একেবারে শেষ যুক্তিসহ পরিণতি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া একটা স্থির অচঞ্চল শান্তির মধ্যে সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। পাঠক অথবা দর্শককে কোনো অস্থির চঞ্চল করুণ ব্যথাভারগ্রস্ত ভাবনার মধ্যে আন্দোলিত হইবার সুযোগ দেন নাই।...আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য-রীতিই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শকুন্তলা'র উল্লেখই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে। 'শকুন্তলা'র যে-দৃশ্যে বিস্মৃতি-হেতু দুষ্মন্ত-কর্তৃক শাপগ্রস্ত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, সেই দৃশ্যটিই সর্বাপেক্ষা চঞ্চল ও বেদনামুখর;

সেইখানে কালিদাস নাটকটির উপর যবনিকাপাত করেন নাই, সমস্ত আখ্যানটিকে আরও ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং একটি পরিপূর্ণ শান্তি ও মিলনের মধ্যে উহাকে সমাপ্তি দান করিয়াছেন।...আমার বিশ্বাস, 'বিসর্জন' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা'র নাট্য-বিন্যাসের কথা না ভাবিয়া পারেন নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তাহার কিছু পরে নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না; তাহা করিতে গেলে সমস্ত নাটকের ঘটনা-বস্তু ও নাট্য-বিন্যাস একেবারে আমূল পরিবর্তন করিতে হয়। শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের এবং তাহার পর সমগ্র নাটকের পরিণতির রহস্য-চাবিটি রহিয়া গিয়াছে ঐ দুর্বাসার অভিশাপটুকুর মধ্যে। এই অভিশাপ না কাটিলে, দুষ্মন্তের বিস্মৃতির কালরাত্রি অতীত হইয়া শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্মিলন না ঘটিলে, নাটকের সমাপ্তি তো আমরা কিছুতেই কল্পনাও করিতে পারি না। 'বিসর্জন'-এ তেমন কিছু কেন্দ্রবস্তু নাই বটে, কিন্তু তাহারও রহস্যটি রহিয়াছে ঐ রঘুপতি-চরিত্রের চরম পরিণতিটুকুর মধ্যে; সেই পরিণতিটুকু বিকশিত হইয়া না উঠিলে 'বিসর্জন' নাটকের সমাপ্তি কল্পনা করা একটু কঠিন।*

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিসর্জন' নাটকে প্রচলিত সাধারণ নাটকের মূল নীতিগুলি—পুরাপুরি না হইলেও, কিছুটা যে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা সহজেই চোখে পড়ে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক প্রবৃত্তির সঙ্গে ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—যাহা সাধারণ শ্রেষ্ঠ নাটকের বিশেষত্ব, 'বিসর্জন' নাটকে তাহা আছে। কাহিনী ও প্লটের নাটকীয় গ্রন্থন, নাটকের সক্রিয় গতিশীলতায় বহু চরিত্রের ও ঘটনার সংযোগ, যথোচিত অঙ্ক ও দৃশ্যযোজনা এবং প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পঞ্চসন্ধিসমন্বিত সুপরিকল্পিত নাট্যরীতি প্রয়োগের চেষ্টা এ নাটকের মধ্যে লক্ষিত হয়। তবু 'বিসর্জন'-এ

* ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা: ২-য় খণ্ড।

লিরিক উপাদানের প্রাধান্য যে ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার এ নাটকেব উৎসর্গ-পত্রে উহার উল্লেখ করিয়াছেন—

রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি
কেহ বলে "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"

কোন কোন সমালোচক এই নাটকে লিরিক উপাদানের সপক্ষে বলিয়াছেন, কেহ বা বিপক্ষে বলিয়াছেন। যাঁহাদের ধারণা—নাটকে গীতিরসের প্রাধান্যের জন্য নাটকের নাট্যরস বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের বক্তব্য—নাটক ও গীতিকবিতা সম্পূর্ণ পৃথক।

In lyric poetry the poet's personality is the chief thing. His soul is the harp on which the outer world plays its harmonies.

অথচ 'বিসর্জন' নাটকে আমরা ইহাই পাইয়াছি। নাটকখানিতে প্রতিফলিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মা। লিরিকের প্রতি তাঁহার যে স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল, নাটক লিখিতে গিয়াও তাহা তিনি এড়াইতে পারেন নাই। সেইজন্য কবির দৃষ্টিতেই 'বিসর্জন' নাটকে জীবন পর্যালোচনা হইয়াছে। নাটকের চরিত্রগুলি হইয়াছে ভাবের প্রতিভূ (Idea Personified)। নাটকখানি পুরাপুরি ঘটনার নাটক নয়—কবির অভিজ্ঞতা, অনুভব ও বিচিত্রমুখী ভাবনাই ইহার অনেকখানি জায়গা জুড়িয়াছে। 'বিসর্জন' বাস্তবিকপক্ষে নাট্যাকারে কাব্য। নাটকখানিতে আখ্যান এবং চরিত্র থাকিলেও, ঘটনার সংঘাত এবং চরিত্রের সংঘাত থাকিলেও, সে সংঘাত শেষ পর্যন্ত ভাবের সংঘাতেই পর্যবসিত হইয়াছে।—

নাটক একান্তভাবে তন্ময় বা objective রচনা, কিন্তু লিরিক মন্ময় বা

subjective রচনা। নাটকে নাট্যকারের নিজের মনের কথা অভিব্যক্তি লাভ করে না, সেখানে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে লোপ ক'রে ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে নাটকের বক্তব্যকে প্রকাশ করেন ; কিন্তু লিরিকে রচয়িতার মনের একান্ত নিজস্ব ভাব ও ভাবনাটুকুই রূপ পরিগ্রহ করে। লিরিকের মধ্যে একটিমাত্র সুর মূর্ছিত হয়, সে সুরটি একান্তভাবেই মৃদু। কিন্তু নাটকে নানারকম সুরের সমাবেশ হয়, কোনো সুর মৃদু কোনো সুর চড়া, কোনো সুর লঘু, কোনো সুর গভীর ; এই সমস্ত সুরের সমন্বয় সাধনের মধ্যেই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। নিবিড় সংহতি ও দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন নাটকের বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে অবান্তর প্রসঙ্গ, অহেতুক উচ্ছ্বাস বা ঢিলাঢালা ধরনের ভাব স্থান পেলে নাটকের আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয় ; নাটকের চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাসংস্থাপন সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সংযম থাকা চাই এবং নাটকের গঠনে একটা কাঠিন্য থাকা দরকার ; কিন্তু লিরিকের মধ্যে অনেকখানি উচ্ছ্বাস ও আত্মগত কল্পনা থাকে। তাই তরলতা ও শিথিলতাই লিরিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাটকের সঙ্গে লিরিকের এই মূলগত পার্থক্যের জন্য কোনো নাটকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে লিরিক উপাদান স্থান পেলে নাটক কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়ে।

নাটকে লিরিক উপাদান প্রাধান্য পাইলে নাটক উহার প্রচলিত আদর্শচ্যুত হয়, এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তবু 'আইনের লৌহ ছাঁচে' তিনি তাঁহার কোনো নাটককেই বাঁধিতে চান নাই— 'বিসর্জন' নাটকখানিতেও নয়।

'বিসর্জন' নাটকে গীতিকবিতার অনেক লক্ষণই সুপ্রকট। ইহাতে আছে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস—নিজস্ব ভাব-ভাবনার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিগত সুতীব্র গভীর অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। নাটকখানি রচয়িতার নিজ প্রাণেরই এক ভাবের উৎসার—উহাতে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রধান। সার্থক গীতিকবিতার মতই 'বিসর্জন' নাটক আত্মভাব-প্রধান। ইহা আত্মনিষ্ঠ সৃষ্টি। নৈর্ব্যক্তিক নয়—ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। গীতিকাব্য যেমন কবিকেই গৌরবান্বিত করে,

সেখানে যেমন বিষয়বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্তেরই বিকাশ ঘটে—'বিসর্জন' নাটকেও তাহাই ঘটিয়াছে। নাটকের সমস্তটাতেই কবির প্রাণস্পন্দন শুনা গিয়াছে। নাটকের ঘটনা কবির ভাবের রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়াও নিজের মনোগত কল্পনায় সেই ঘটনা ও চরিত্রসমূহকে তিনি আর এক চোখে দেখিয়াছেন। কবির চোখে ঘটনা ও চরিত্র যেমনটি প্রতিভাত হইয়াছে—বাস্তবের আনুগত্য ছাড়িয়া, উহাকেই তিনি তাঁহার নাটকের নাট্য-বস্তু করিয়া লইয়াছেন।

কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন বন্ধনমোচনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সেই বন্ধনমোচনের গান 'বিসর্জন' নাটকে শুনা গিয়াছে। নাটকের মধ্যে উন্নততর মহত্তর জীবনের স্বপ্নে তিনি বিভোর হইয়াছেন। যাহা শিব ও সুন্দর তাহার মহিমাকে প্রকট করার প্রয়াস এখানে লক্ষিত হইয়াছে।

সঙ্কীর্ণ কোনো ধর্মবন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ কখনও স্বীকার করিতে পারেন নাই। যে ধর্ম মানুষের মিলনের পরিপন্থী, যে ধর্মের অনুশীলনে মানুষের চোখে অশ্রু ঝরে, সে ধর্ম তাঁহার মনের অনুকূল ছিল না। যে ধর্ম ভেদের গণ্ডি টানে, মানুষকে কোনো ঐক্যের সূত্রে বাঁধিতে পারে না, যাহা হিংসা বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয়, যাহা শান্তি ও মৈত্রীর পরিপন্থী, সেরূপ ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কাম্য ছিল সত্যধর্ম—সে ধর্ম মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্ম পৃথিবীতে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে বিগলিত করে।

যে ধর্ম মানুষের অন্তরকে মহৎ উদার করে, যে ধর্ম মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা উৎসারিত করে, তেমনি এক ধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটিয়াছে, নাটকের মধ্যেও সেই আদর্শেরই জয়গাথা উচ্চারিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যে নিত্যধর্মের কথা তাঁহার বিভিন্ন কাব্যনাটকে বলিয়াছেন, তাহার সহিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রভেদটি সুস্পষ্ট। আনুষ্ঠানিক ধর্ম বিচারবর্জিত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ ধর্মে নানাবিধ অর্থহীন সংস্কার জন্ম লয়। ইহাতে আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপই মুখ্য হইয়া উঠে। ইহা মানুষকে বন্ধনমুক্তির গান শুনাইতে পারে না। মানুষকে সীমা হইতে অসীমে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। উহা মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা না করিয়া মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া তোলে। তখন সমাজে ও রাষ্ট্রে শুরু হইয়া যায় অন্তহীন বিরোধ—মনুষ্যত্ব হয় লাঞ্ছিত, ঘটে আত্মার বিনষ্টি। 'বিসর্জন' নাটক রচনার সময় হইতে সত্যধর্ম বা মানবধর্মের সঙ্গে আচারগত ধর্মের সংঘাত রবীন্দ্রনাথে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লিরিক যেমন ভাবের বাণীবিগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকও তেমনি ভাবতত্ত্বের আধার, ভাবের ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। নাটকে প্রেমের সর্বজয়ী ক্ষমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। সংস্কারের দুর্দমনীয় শক্তির সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে। এই প্রেম 'বিসর্জন' নাটকের গোবিন্দমাণিক্যে, অপর্ণায় ও জয়সিংহে। সুদীর্ঘকালের প্রথাসংস্কার শক্তি সঞ্চয় করিয়া কিভাবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কবি দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন যে—যুগসঞ্চিত পাপ মঙ্গলবিধান না করিয়া পীড়ন ও ব্যথাবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু প্রেমের অমৃতনিষেকে সেই অন্যায় ও অসত্য ধ্বংস হইয়াছে।

'বিসর্জন' নাটক বাস্তবিকপক্ষে প্রেমের বিজয়গাথা। প্রেম এখানে মানুষকে মিথ্যার বন্দীশালা হইতে, সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির আহ্বান শুনাইয়াছে। অপর্ণা প্রেমের ভাবপ্রতিমা—Personified প্রেম। Abstract প্রেমের, একটা অমূর্ত idea-রই concrete

রূপ। তাহার শক্তি অপরিমেয়। সে যুগ-যুগান্তের জড়তাকে জয় করার জন্য নাটকে আবির্ভূতা। আর সকলে যেখানে প্রথাপদ্ধতির দাসত্বশৃঙ্খলে নিজেদের বন্দী রাখিয়াছে, সেখানে অপর্ণা মিথ্যার মুখোসটাকে খসাইয়া সত্যের আলো জ্বালাইবার সাধনা করিয়াছে। সেই সাধনায় তাহার সিদ্ধিলাভও আমরা দেখিয়াছি। প্রেমের আলোর সহায়তায় পথের সন্ধান সে দিয়াছে। তাহার কাছ হইতেই প্রেরণা পাইয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। নাটকে একদিকে ছিল রঘুপতির প্রভুত্ব-ইচ্ছা, অন্যদিকে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তি। রাজা চাহিয়াছেন প্রেমকে জয়ী করিতে, রঘুপতি প্রভুত্বকে। রঘুপতির প্রভুত্ব সংস্কারের উপর দাঁড়াইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শক্তি পরাভূত হইয়াছে প্রেমের কাছে।

নাটকের শেষে জয়সিংহের যে আত্মত্যাগ, তাহার মূলেও রহিয়াছে প্রেম। প্রেম যে হিংসার পথে চলে না, জয়সিংহের আত্মাহুতি তাহারই দৃষ্টান্ত। নাটকে দেখানো হইয়াছে—সত্য প্রেমের দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রেমই রঘুপতিকে অন্ধসংস্কার, মিথ্যা ও হিংসার পঙ্কিল আবর্ত হইতে অহিংসা ও সত্যের বিরাটত্বের মধ্যে আহ্বান করিয়াছে।

এ নাটকে আর একটি ভাব প্রকট হইয়াছে—সে ভাবটি সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব। নাটকের পটভূমিতে রহিয়াছে পাথরের মন্দির—সীমার পাষাণপ্রাচীর। মূঢ় প্রথা, বিচারবিহীন আচার, অন্ধ সংস্কার অসীমের মধ্যে মুক্তিপিপাসু মানুষের জীবনকে অতি সঙ্কীর্ণ একটি গণ্ডির মধ্যে কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়াছে। সঙ্কীর্ণ সেই সীমাটুকুর মধ্যে যে জীবন বন্দী ছিল, তাহা মুক্তির জন্য অধীর হইয়াছে। অসীমের আহ্বান অপর্ণার মাধ্যমে সীমার গণ্ডির মধ্যে পৌঁছিয়াছে।

জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। অপর্ণা আসিয়া জয়সিংহের মধ্যে জাগাইয়াছে চাঞ্চল্য। একদিকে রঘুপতি চাহিয়াছে জয়সিংহকে মন্দিরের সীমানায় বাঁধিয়া রাখিতে, অন্যদিকে অপর্ণা তাহাকে তাগিদ দিয়াছে মন্দির ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য। শেষ পর্যন্ত অপর্ণাই বিজয়িনী হইয়াছে—অসীমের আহ্বানই জয়ী হইয়াছে। সীমার প্রাচীরের মধ্য হইতে অসীমের পানে প্রসারিত হইয়াছে জয়সিংহের চিত্ত। রঘুপতির সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। তিনিও প্রথাবদ্ধ জীবনের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সীমা হইতে অসীমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

নাটকের শেষাংশটি সঙ্কেতময়। কবি দেখাইয়াছেন—শরতের প্রথম দিনটি নাটকের শেষ দিন। সেই দিনটিতে গুণবতী পূজা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তিনি দেবীকে পাইলেন না ; কিন্তু স্বামীকে নূতন কবিয়া পাইলেন। রঘুপতি অপর্ণার মধ্যে নূতন করিয়া জয়সিংহকে পাইয়াছেন। শ্রাবণের শেষ দুর্যোগের মধ্যে জীবরক্তপায়ী পাষাণপ্রতিমার বিসর্জন হইয়াছে, শরতের প্রথম প্রত্যূষে জীবজননীর আগমনী শোনা গেল। নাটকের শেষে পুরাতনের বিসর্জন, নূতনের আগমনী। হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার নূতন পালার সূচনা।

'বিসর্জন' নাটকের লিরিক-উপাদান বিচারকালে উহার ভাষাও নজরে পড়ার মত। নাটকটি কাব্যচ্ছন্দে লিখিত, সুতরাং সেই সূত্রে এ নাটকে যে কিছুটা লিরিক-উপাদান থাকিবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক। কাব্যচ্ছন্দে নাটক লিখিত হয়। তবে সেক্ষেত্রে দেখিতে হয় যে, সেই গীতিচ্ছন্দ নাটকের ক্রিয়াকেও আচ্ছন্ন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে কি না। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকও কাব্যচ্ছন্দে রচিত। তাঁহার বহু নাটকের স্থানে স্থানে গীতিকাব্যের সুর ধ্বনিত। কিন্তু

উহা নাটকের গতিকে ভারাক্রান্ত করে নাই। মানবজীবনের অর্থহীনতা সম্বন্ধে ম্যাকবেথের সুবিখ্যাত উক্তি "Tomorrow and tomorrow" ইত্যাদি নিঃসন্দেহে গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু উহাতে 'ম্যাকবেথ'-এর নাট্যক্রিয়া ব্যাহত হয় নাই। অনুরূপ-ভাবে 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর আদালত-দৃশ্যে পোর্শিয়ার 'করুণা'-সম্পর্কিত বক্তৃতাটিরও উল্লেখ করা যায়। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। 'বিসর্জন'-এ গীতিকাব্যের উপাদান—প্রধানত জয়সিংহ ও অপর্ণার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। ভাষাভঙ্গির দিক হইতেও দেখা যায়, জয়সিংহের বহু সংলাপ লিরিক ভাবে আচ্ছন্ন। যথা—

এ ধরায় কত
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল,—মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হতে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে।

অথবা,

কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন করেই যাই, দিবা অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার-বিচার তর্ক-বিতর্কের জল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;

দু'চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু'চারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয়-দুঃখ-সুখ
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতা বশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম !
এই ত সংসার।

গোবিন্দমাণিক্যের বহু উক্তির মধ্যেও এমনিতর গীতিকবিতাসুলভ উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ লিরিকধর্মী সুদীর্ঘ সংলাপ নাটকের গতিপথের অন্তরায়। সুতরাং এই গীতি-কবিতার সুর যে 'বিসর্জনে'-এর নাটকত্বকে কিছু পরিমাণে ক্ষুন্ন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ত্রুটির কথা এই যে, গোটা নাটকটিই কবির মানসধর্মের অনুরঞ্জিত একটি ভাবসত্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কবি নাটকীয় চরিত্রকে রূপায়িত না করিয়া নিজস্ব ভাবনাকে রূপায়িত করিবার জন্যই যেন নাটকের চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করিয়াছেন। এই কারণেই পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানে নাটকের সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল, তাহা না হইয়া নাটকখানির সমাপ্তি ঘটিয়াছে পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে—যেখানে রবীন্দ্র-মানসের, ভাবনার বা আইডিয়ারই বিজয়োৎসব। নাটক অপেক্ষা এখানে কবিমনেরই প্রাধান্য। কবি তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণের আকৃতিটি সার্থক না হইয়াছে, ততক্ষণ থামিতে পারেন নাই—আপনার উপলব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন। শেষ দৃশ্যে রাজা রাণীকে পাইলেন, রাণী রাজাকে পাইলেন, রঘুপতি অপর্ণাকে পাইলেন; কিন্তু নাট্যধর্ম অনুসারে এই পাওয়ার কোনোরূপ পূর্বপ্রস্তুতি নাই, সকলই যেন আকস্মিকভাবে ঘটিয়া

গেল। প্রতিমা বিসর্জিতা দেখিয়া চিরকাল দেবীর প্রতি ভক্তিমতী রাণীর মনে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সবচেয়ে চোখে পড়ে অপর্ণার ব্যাপার। জয়সিংহকে মৃত দেখিয়া যে-মানবী অপর্ণা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষণপরে সে ভাবলেশহীন দেবী হইয়া উঠিল। ইহার কারণ, সমস্ত অপর্ণা-চরিত্রটিই একটি ভাবসত্যের লিরিক রূপ। যে-চরিত্র নাটকের একটি প্রধান অংশ, তাহাই যদি রক্তমাংসের না হইয়া কবিমনের একটা ভাবের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, তবে নাট্যরস বিশেষ মাত্রায় ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। তবে পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পর্যন্ত 'বিসর্জন'-এর বিচার করিলে বলিতে হয়, ঐ পর্যন্ত নাটকে যে পরিমাণ গীতিকবিতার প্রাধান্য আছে, তাহাতে নাটকীয় সংঘাত বড় একটা যে ব্যাহত হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। কারণ, ঐ পর্যন্ত নাটকের ঘটনাবিন্যাস দৃঢ়, ক্রিয়ার দ্রুতিও লক্ষণীয় এবং নাটকীয় চরিত্রের সংঘাতে ও বিকাশে, দ্বন্দ্বের তীব্রতায় নাট্যরস ঘনীভূত। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের সপক্ষে যত কিছুই বলা যাক না কেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ঐ দৃশ্যটি 'বিসর্জন'-এর উপর গীতিকবিতার যে-ছায়াপাত করিয়াছে, তাহাতে সত্যকার ট্র্যাজেডির আলোক অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, অনেক স্থলে নাটকীয় চরিত্রের দীর্ঘ উক্তিগুলিও নাট্যরসকে মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এক কথায়, রবীন্দ্র-নাটক নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে নাই, ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাই নাটক-বিচারে দোষ ও রবীন্দ্র-নাটক-বিচারে গুণ।

'বিসর্জন' নাটকের চরিত্রগুলি বিশেষত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি নাটকীয় চরিত্রের একটি প্রধান গুণ হয়, তবে বলিতে হইবে—জয়সিংহ একটি সার্থক নাটকীয় চরিত্র। যদিচ জয়সিংহের

বহু সংলাপ লিরিক-উপাদানে পূর্ণ, তপাপি ভাবের দিক হইতে, চরিত্র-বিকাশের দিক হইতে জয়সিংহ আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

নাটকে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত জয়সিংহের পরিচয় এই যে, সে রাজপুত-বংশোদ্ভূত। কিন্তু শৈশব হইতেই অনাথ এবং রঘুপতি-কর্তৃক পালিত। বাল্যের সংস্কারবশত সে তাই রঘুপতিকেই সংসারে একমাত্র আপনার জন বলিয়া জানিত, তাঁহাকে সে একান্তভাবে ভক্তি করিত ও নির্বিচারে তাঁহার আদেশ-পালনকেই জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। রঘুপতির এই অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তাহাকে একান্তভাবেই রঘুপতি-নির্ভর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য, মৌলিক চিন্তাধারা সকল কিছুই সে গুরুভক্তির মধ্যে হারাইয়াছিল। এইভাবেই তাহার চিত্তে যে-দুর্বলতা আশ্রয় করিয়াছিল, উহাই পরে বিরুদ্ধ সংঘাতের সম্মুখীন হইয়া কেবলই সন্দেহ দোলায় দুলিয়াছে এবং অবশেষে কোনো সমস্যার মীমাংসা না করিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিয়াছে। রঘুপতির শিক্ষাতেই সে বুঝিয়াছিল, দেবীপ্রতিমা বাস্তব সত্য, পশুবলি দেবীপূজার অপরিহার্য অঙ্গ। উদার ও মহৎহৃদয় বলিয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রতিও তাহার একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। মূলত সারল্য ও সহজ বিশ্বাসই ছিল তাহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। সেখানে কোনো দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। কিন্তু অপর্ণা আসিয়াই তাহার মনে প্রথম দ্বন্দ্ব জাগাইল। ক্ষুদ্র একটি ছাগশিশুর প্রতি অপর্ণার আকর্ষণ ও অপর্ণার হৃদয়ের প্রেমস্পর্শের সাক্ষাৎ যেদিন সে পাইল, সেদিন তাহার এতদিনকার পরিচিত জগতের রঙ বদলাইয়া গেল, তাহার অভ্যস্ত মূল্যবোধে চিড় ধরিল। তাহার মনে এই সংশয় জাগিল, "আনুষ্ঠানিক পূজা সত্য, না স্নেহ-প্রেম সত্য? মন্দিরের দেবী সত্য

না হৃদয়ের স্বভাবজ অনুভূতি সত্য ?" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে,—

অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ববিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হতে শুরু হল। গোবিন্দমাণিক্য এই পশুবলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে—যখন তার বিচার করবার শক্তি জন্মায় নি, তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হল—রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের জড়তা। এই অভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় করে দিয়েছিল, অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিল যে. কত বড় অন্যায়কে সে সমর্থন করে এসেছে। অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল করে দিলে। যে জীবকে অপর্ণা কোলে করে পালন করেছে, তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়ছে, এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বললে—'এ কি তোমার মায়া ? এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠছে, আর তুমি বিশ্বজননী হয়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই ?' জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সে এই প্রথম আঘাত পেল, তারপর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্ধিত আকার ধারণ করল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুই দিক হতে আকর্ষণ করতে লাগল। একদিকে অপর্ণা তাকে মন্দির ত্যাগ করতে বলছে, অপরদিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় ধরে রাখতে চায়।···জয়সিংহ সেই দোলনার মাঝখানে পড়ল এবং কোনটা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

কখনো তাহার মনে হয় অপর্ণার পথ—প্রেমের পথই বরণীয় ; আবার রঘুপতির প্রভাবে সে সংকল্প করে—'এ প্রাণ থাকিতে অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।' রঘুপতিকে যখন সে দেবীর আদেশের দোহাই দিয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণ লইতে প্ররোচিত করিতে দেখে, তখন গুরুর মুখের উপরেই সে বলে, 'ছি ছি! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল রক্তপিপাসিনী!' আবার পরক্ষণেই রঘুপতির উপর

পরম নির্ভরের কথা জানায়—'তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার দাঁড়াবে কোথায় ?' ক্রমে গুরুর প্রতি বিশ্বাসও টলিতে থাকে, সে বলে—'থাক্ প্রভু বোলো না স্নেহের কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।' রঘুপতিকে যখন দেবী-প্রতিমার অন্তরাল হইতে তাহার 'বল্ চণ্ডি, সতই কি রাজরক্ত চাই ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে 'চাই' বলিতে সে শুনে, তখন এই হীন আচরণের জন্য গুরুর প্রতি সে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, দেবীর প্রতিও বিশ্বাস হারায়। সে বলে—

এ কি হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু—বিশ্ব মাঝে
কিছু রহিল না আর!

জয়সিংহ যেন এক পরম শূন্যতার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন সে জীবনের প্রতি আকর্ষণও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। দেবীকে লক্ষ্য করিয়াই তাই সে বলে—

দেবি, আছ, আছ তুমি! দেবি, থাক তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্ব প্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল মোরে
"বৎস আছি।"—নাই! নাই! দেবী নাই।
নাই? দয়া করে থাক। অয়ি মায়াময়ি
মিথ্যা, দয়া কর, দয়া কর জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই? এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য মাঝে!

এই সর্বশূন্যতার মধ্যে মানুষের বাঁচিয়া থাকা চলে না, সুতরাং

জয়সিংহ আত্মবলি দিল। ইহা তুচ্ছ আচার ও সংস্কারের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি। কিন্তু এই আত্মদান কি—

মানুষকে কোনও মহত্তর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই? এত বড় বিসর্জন কি মানুষের অন্ধকার চিত্তপুরীতে একটি কক্ষও আলোকিত করে নাই? করিয়াছে, রঘুপতিকে সে জীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা অন্ধ আচার ও সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকরেখার দিকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে। [রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়]

এইখানেই জয়সিংহ-চরিত্রের সার্থকতা।

নাটকে রঘুপতির পরিচয় তিনি রাজপুরোহিত। নাট্যদ্বন্দ্বের দিক হইতে তিনি গোবিন্দমাণিক্যেরর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি—অর্থাৎ প্রেমের তাত্ত্বিক আইডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথার প্রতীকরূপে চিত্রিত। কিন্তু কার্যত রঘুপতি-চরিত্র একটি আইডিয়ার প্রতীক হইয়াই থাকে নাই, রক্ত-মাংসে গড়া আশ্চর্য জীবন্ত পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত রবীন্দ্র-নাটকে এমন প্রাণপ্রাচুর্যময় দুর্জয় শক্তিমান চরিত্র আর দ্বিতীয় নাই। সংস্কার ও প্রথার জালে তিনি আবদ্ধ। জীবরক্ত ভিন্ন যে দেবীর তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় না—এই ধারণায় তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী। কিন্তু চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, গোড়া হইতে এই চরিত্রের পতনের পূর্ব পর্যন্ত একটি প্রবল অহং-চেতনা চরিত্রটিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই অহং প্রধানত ব্রাহ্মণত্বের ও প্রদীপ্ত বুদ্ধির। ইহাই তাঁহার সমগ্র সত্তার ধারক। যেখানেই এই অহং-বোধে আঘাত লাগিয়াছে, সেখানেই রঘুপতি অসহ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। রাজপুরোহিত তিনি, যথাবিধি চিরকালাগত প্রথানুসারে ত্রিপুরেশ্বরীর পূজাই তাঁহার কর্তব্য। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে তিনি একক ও একরাট্। সেখানে কাহারও হস্তক্ষেপ তাঁহার নিকট অসহনীয়। তাই গোবিন্দমাণিক্য যখন বলি বন্ধ

করিয়া পুরোহিতের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি দৃপ্ত রোষে রাজাকে বলিলেন,

> তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
> ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
> তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
> বলি? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
> মায়ের সেবক।

তাঁহার ক্ষোভ এইজন্য যে,

> বাহুবল রাহুসম
> ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
> তোলে শির যজ্ঞবেদী 'পরে!

তাঁহার মনে ব্রাহ্মণোর অহং-বোধ এমনি প্রদীপ্ত যে, তাহার অপমান, তাহার ক্ষমতার হ্রাস তিলমাত্রও তিনি সহিবেন না? এই অহং-বোধই তাঁহাকে দিয়া উচ্চারণ করায়—

> আমি আছি যেথা, সেথা এলে
> রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে
> মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে।

এইজন্য তিনি 'দণ্ড-সিংহাসন হবিকাষ্ঠে' পরিণত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আধিপত্য তিনি কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না। ইহার জন্য তিনি যে-কোনোরূপ উপায় অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি রাণীকে রাজার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছেন, রাজভ্রাতা নক্ষত্রকে রাজদ্রোহী হইবার পরামর্শ দিয়াছেন, নিজেই প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া প্রজাগণকে প্রতারণা দ্বারা উত্তেজিত করিয়াছেন, এমন কি 'রক্ত চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া দুর্বলচিত্ত জয়সিংহকে রাজহত্যায়

নিয়োগ করিয়াছেন। আপনার অহংকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পাপপুণ্যবোধ ন্যায়-অন্যায়বোধ সকলই তিনি বিসর্জন দিয়াছেন। ক্ষুদ্র শিশু ধ্রুবকে হত্যা করিতেও তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন, সেজন্য বিবেকের কোনো দংশন তিনি অন্তরে অনুভব করেন নাই। জয়সিংহকে তিনি প্রাণের অধিক ভালোবাসেন, শিশুকাল হইতে মায়ের অধিক স্নেহে তাহাকে লালন করিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহার 'প্রাণে অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ'। এই ক্ষেত্রেও তিনি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিতে পারেন নাই। জয়সিংহকে কেহ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, ইহা তাঁহার কাছে ছিল অসহ্য। তাই অপর্ণা আসিয়া যখনই জয়সিংহকে ডাকে, অপর্ণাকে তিনি ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দেন : বলেন—

দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী। জয়সিংহে চাহিস্ কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে ওরে উপদেবী ?

এখানে দেবী রঘুপতিরই নামান্তর।

কিন্তু এই অত্যধিক স্নেহই তাঁহার অহং-বোধেরও কাল। এই স্নেহই যখন একদিন প্রবল উচ্ছ্বাসে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন তাহার উদ্দাম স্রোতে রঘুপতির ব্রাহ্মণ্যগর্ব, দীপ্ত অভিমান, দুর্জয় সংস্কার সকল কিছুই ভাসিয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অন্তরের এই দুর্বলতম দিকটির প্রতি তেমন সচেতন ছিলেন না। কিন্তু জয়সিংহ যে মুহূর্তে তাঁহার অহংকারের নিষ্ঠুর বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিল, সেই মুহূর্তেই তাঁহার সকল অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁহার খসিয়া পড়িল, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে তিনি যেন 'গৃহচ্যুত হতজ্যোতি' তারকার মতন কোথায় গিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার অন্তরাত্মা কেবল জয়সিংহকেই চাহিয়াছে—

ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি ; অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্ ! তুই আয় !

এই হাহাকার, দুর্জয় শক্তির এই পতনই রঘুপতি-চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য নাট্যকার এই পতনের পরেও রঘুপতির একটি আত্মিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যভঙ্গির জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল ; কিন্তু উহা না ঘটিলেও, একান্ত রিক্ত রঘুপতি 'বিসর্জন'-এর অপর সকল চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া থাকিতেন।

গোবিন্দমাণিক্য 'বিসর্জন'-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র। কিন্তু যে শান্ত স্তব্ধ ও অচঞ্চল পটভূমিকার উপর নাটকে চরিত্রটি চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহাতে চরিত্রটি গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একই রহিয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে কোনো বিকাশ, কোনো দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। এই কারণে চরিত্রটি তেমনভাবে আমাদের মনোযোগও আকর্ষণ করে না। ইহার কারণ, চরিত্রটিকে একটি ভাবের বাহনরূপেই নাটকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং সেই হেতু চরিত্রটির মধ্যে রক্তমাংস অপেক্ষা তত্ত্বেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, লোকোত্তর পুরুষের মতো তিনি একাধারে বজ্রকঠিন ও কুসুমকোমল—একদিকে প্রেমে দ্রবীভূত, অপরদিকে কর্তব্য-পালনে অতীব কঠোর। রাজা হিসাবে তিনি একজন আদর্শ রাজা। দরিদ্র অবহেলিত প্রজার অভিযোগও তিনি শ্রবণ করেন এবং উহার প্রতিবিধানে তৎপর হইয়া উঠেন। অপর্ণা এক ভিখারিণী বালিকা, কিন্তু তাহার সামান্য ছাগশিশু অপহরণের

বৃত্তান্তও গোবিন্দমাণিক্যকে বিচলিত করিয়া তোলে। উহারই সূত্র ধরিয়া তাঁহার অন্তরস্থিত প্রেমবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে। তিনি চিরাচরিত নিষ্ঠুর প্রথার সম্বন্ধে কেবল সচেতনই হন না, রাজকর্তব্যবোধে সেই হৃদয়হীন প্রথার বিরুদ্ধে রাজাজ্ঞা ঘোষণায় এতটুকুও দ্বিধার প্রশয়দান করেন না। রাজপুরোহিতের রক্তচক্ষুও তাঁহাকে সংকল্প হইতে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। বলিদান পাপ, হিংসা পাপ—এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সংশয়ই নাই। তিনি বলেন—

স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে! আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

এই সংশয়হীনতা এবং একমুখীনতার মধ্য দিয়াই চরিত্রটি প্রতিবেশের সকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও একটি মহৎ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। স্ত্রীর শত অনুরোধ-অভিমান উহাকে টলাইতে পারে নাই, ভ্রাতার রাজদ্রোহিতা এবং প্রজাবিদ্রোহেও সেই উচ্চ আদর্শ হইতে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। ধ্রুবকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধী ভ্রাতাকে শাস্তি দিবার সময়েও তিনি কুলিশকঠিন ন্যায়বিচারক। কারণ, বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ, বন্দী হতে বেশি বন্দী। নাটকের শেষ অংশে গোবিন্দমাণিক্য একেবারে স্নেহশূন্য নহেন, সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্বহীন নহেন। বিচারকরূপে ভ্রাতাকে শাস্তি দিলেও ভ্রাতারূপে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই বলিয়া ক্ষোভও করিয়াছিলেন—

রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড় নি কি

অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া ?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবার অবসর দিবে না কি শুধু ?

এই বেদনা দ্বারাই গোবিন্দমাণিক্য তত্ত্বের সুদূর স্বর্গলোক হইতে বাস্তব মর্ত্যভূমির স্পর্শ লাভ করিয়া কিছুটা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই বেদনাই তাঁহাকে রাজ্য হইতে স্বেচ্ছানির্বাসনে উদ্বোধিত করিয়াছিল। তথাপি সমগ্র নাটকটির পরিপ্রেক্ষিতে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিশেষ প্রকাশ নাই।

'বিসর্জন' নাটকের একটি প্রধান চরিত্র রাণী গুণবতী। তিনি রাণী, ঐশ্বর্যের তাঁহার অভাব নাই, কিন্তু একটি অভাবের জন্যই তিনি তাঁহার দীনতমা প্রজা হইতেও দীনা। তিনি সন্তানহীনা। তিনি 'আপনার প্রাণের ভিতরে আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে অনুভব' প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অথচ আশ্চর্য এই, একটি প্রাণের জন্য তিনি শত শত জীববলি দিতে কুণ্ঠিত নহেন। অর্থাৎ, প্রাণের যথার্থ মূল্য তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত। মূলত তাঁহার এই অবোধ অন্ধতাই 'বিসর্জনে' বিরোধের বীজ বপনে সাহায্য করিয়াছে, রঘুপতিকে তাঁহার দলে টানিয়া আনিয়াছে এবং রাজাকে বিরুদ্ধ শক্তিরূপে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্বই 'বিসর্জন'-এর মূল কথা। গুণবতী ও গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যে-বিরোধ, উহাতে প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্বের আভাস রহিয়াছে। গুণবতী আপনার সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রতাপ, অর্থাৎ নিজের অভিমান ও রোষ দিয়াই স্বামীর প্রেম লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ দ্বারা যে প্রেম লাভ হয় না, একথা তিনি বুঝেন নাই। তাই প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তিনি শিশুহত্যার মতো পৈশাচিক কার্যে

পর্যন্ত ব্রতী হইয়াছেন। ইহা গুণবতীর একান্ত স্বার্থপর হৃদয়েরই পরিচায়ক। তাঁহার ছেলের অংশ অপরে লাভ করিবে, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য। ধ্রুবকে দেখিয়া তাই তাঁহার ঈর্ষাকাতর হৃদয় বলিয়া উঠিয়াছে—

রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক।
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস্ তুই
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ 'পরে তুই বসাইলি ভাগ।
রাজ-হৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি, রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী!

গুণবতীর সমস্ত হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া আছে একটি বিষয়—সন্তান। উহার বাহিরে কোনো জগৎকেই তিনি জানেন না, চিনেন না। ইহার জন্য তিনি শিশুহত্যায় নক্ষত্র রায়কে প্ররোচিত করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। নাটকের শেষে যখন তিনি একজন সাধারণ নারীর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন, যখন আর তিনি রাণী নহেন, তখনও তাঁহার মন এই উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে যে, গোবিন্দমাণিক্য যখন আর রাজা নহেন, তখন গুণবতীর পক্ষে মন্দিরে বলিদানের বাধাও অপসৃত। তখন নিজের অলংকারের বিনিময়ে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন গুণবতী।

এই পর্যন্ত গুণবতী-চরিত্র বাস্তব। কিন্তু নাট্যকারের জন্যই শেষ দৃশ্যে সেই বাস্তবতা আর রক্ষিত হয় নাই। রঘুপতির মুখে 'দেবী নহে' জানিয়াই তিনি সহসা রাজার অনুরাগী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।' এই পরিবর্তনের জন্য কোনোরূপ পূর্বপ্রস্তুতি নাই। সেই দৃশ্যে স্বামিপ্রেম তিনি

ফিরিয়া পাইলেন, গোবিন্দমাণিক্যকে বলিলেন—'আজ দেবী নাই—তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।' ইহাতে প্রথার অপসারণে প্রেমের উদ্বোধন ও জয় ঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নাট্যরসের দিক হইতে গুণবতীর চরিত্র আকস্মিকভাবে এক ভাবলোকে বিলীন হইয়াছে। অবশ্য কবিরও উহাই কাম্য। এই দিক হইতে গুণবতী-চরিত্র ও নাটকের মূল কল্পনার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই।

'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা-চরিত্র একটি ভিখারিণী বালিকারূপে কল্পিত। নাটকে যে-প্রেমের জয় সূচিত হইয়াছে, অপর্ণা সেই প্রেমেরই উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছাগশিশুকে উপলক্ষ্য করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে সে একটি নির্মম প্রথা সম্বন্ধে সংশয় জাগাইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য বলিয়াছেন—

এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?

এবং এই সংশয়ের সূত্র ধরিয়া রাজার মনে সে সত্যকেও উদ্বোধিত করিয়াছে। রাজা বলিয়াছেন—

বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

ইহার পরেই গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যে বলি নিষিদ্ধ করিলেন, শুরু হইল নাটকের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। অপর্ণা পরোক্ষে এই বিরোধের কারণ হইয়াছে। বস্তুত অপর্ণা নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে তেমনভাবে যুক্ত না থাকিলেও, তাহার প্রভাব সমগ্র নাটকে প্রবল-ভাবে অনুভূত হয়। প্রেমের ভাবমূর্তিরূপে নাটকের ভাবসত্তাকে সে

ধরিয়া রাখে। তাহার চরিত্রে মানবিক অনুভূতির প্রকাশ কিছুটা দেখিতে পাই কেবল জয়সিংহ সম্পর্কে। যখন সে বলে—

জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি।—

তখন মনে হয়, বালিকার মনে যৌবনের স্পর্শ লাগিয়াছে, ভাবরূপ হইতে বাস্তবরূপে সে পৌঁছিয়াছে। এই বাস্তবতা জয়সিংহের আত্মবলির পর তাহার মূর্ছা পর্যন্তই বর্তমান। কিন্তু শেষ দৃশ্যে এই বাস্তবতা আবার ভাবের স্বর্গলোকে পাখা মেলিয়া দিয়াছে, সেখানে তাহার মানব-হৃদয়ের বাস্তব রূপটি আর দেখা যায় না। সে তখন এমন শান্ত স্থির, যেন তাহার উপর দিয়া কোনও ঝড়ই বহিয়া যায় নাই। নাটকের শেষভাগে সে বার দুই-তিন শুধুমাত্র বলিয়াছে, "পিতা, চলে এস! পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।" এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া যেন এই মর্মটিই ব্যক্ত হইল যে, সে যে-সত্যের রহস্যমূর্তি, সেই সত্যটাকেই শেষ পর্যন্ত সে জয়ী করিয়া লইল, কিছুই তাহাকে ও বিচলিত করিতে পারিল না। সেই সত্যের আহ্বানই রঘুপতিকে দেবীহীন মন্দির হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল।

বালিকা অপর্ণা শেষ পর্যন্ত সত্যের রহস্যমূর্তি। আসলে অপর্ণা—

একটি শাশ্বত সত্য, যাহার গন্ধ মধুর, যাহার স্পর্শ কোমল, যাহার রূপ সুন্দর, যাহার কোনো জন্ম নাই, বিকৃতি নাই, মৃত্যু নাই; একটি অবিকৃত সহজ সরল সত্যের সে রহস্যমূর্তি। বালিকার রূপ ধরিয়া স্নেহের ও প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ রাজ্যের মধ্যে জয়সিংহকে, সকল মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে। অপর্ণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।...

সে তাহার নিজের জবীনকে বিকশিত করে না, কোনো পরিণতির দিকে চালনা করে না, একটি 'আইডিয়া'-কেই উদ্ঘাটিত করিতে সাহায্য করে, সে সত্যেরই অস্পষ্ট মূর্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া নাটকের সত্যটি ফুটিয়া উঠে।*

'বিসর্জন' নাটকে নক্ষত্র রায় একটি গৌণ চরিত্র হইলেও নাটকীয় ক্রিয়ার মধ্যে এই চরিত্র অনেকখানি সক্রিয় অংশ করিয়াছে। তিনি রাজভ্রাতা, কিন্তু তাঁহার চরিত্র দুর্বলপ্রকৃতির। তাঁহার বুদ্ধিও অল্প। বস্তুত তিনি মেরুদণ্ডহীন, তাঁহার মধ্যে নিজস্বতা কিছুই নাই, অনেক সময় তিনি অপরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার চরিত্রের এই পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ-মাণিক্য বলি নিষিদ্ধ করিয়াছেন শুনিয়া মন্ত্রী যখন বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, 'নিষেধ'! তখন নক্ষত্র রায় সেই কথারই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, 'তাইত! বলি নিষেধ!' আবার রঘুপতি যখন গোবিন্দমাণিক্যকে বলিয়াছেন---

তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

তখন নক্ষত্র রায় উহারই অনুসরণে বলিয়াছেন—

তাই ত কি বল মন্ত্রী,
এ বড় আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

রঘুপতির উপর 'আমি' শব্দটির মধ্যে রঘুপতির ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট, কিন্তু নক্ষত্র রায়ের উক্তিতে সেরূপ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাই। এই ব্যক্তিত্বহীনতার ছিদ্রপথেই রঘুপতি নক্ষত্রকে আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির ক্রীড়নক করিতে পারিয়াছেন, গুণবতীও তাঁহাকে ধ্রুব-হত্যার মতো নৃশংস কাজে প্ররোচিত করিতে পারিয়াছেন। অপরে যাহা

* রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

বোঝায়, নক্ষত্র রায় তাহাই বুঝেন। রাজ্যের প্রতি তাঁহার লোভ আছে, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করিয়া রাজা হইবার সাহসও তাঁহার নাই। আবার এই ভয়ের সঙ্গে স্নেহও মিশ্রিত রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নক্ষত্র রায় সত্যই ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাই রঘুপতি যখন রাজাকে হত্যা করিতে বলেন, তখন নক্ষত্র রায় বলেন—

সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভাল!

গোবিন্দমাণিক্যের পদতলে পড়িয়া ক্ষমাও চাহেন, বলেন—

রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা! রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে।

কিন্তু দুর্বলচিত্ত নক্ষত্র রঘুপতির সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি, রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি চাঁদপাল ও মোগল-সেনাপতির হাতের ক্রীড়নক হইয়াছেন। একদিকে লোভ, অপরদিকে স্নেহ ও ভয়, এই দুই-এর মাঝখানে পড়িয়া নক্ষত্র রায় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই দ্বিধাগ্রস্ত দোলায়িত ভাবটি নাটকে সুন্দরভাবে পরিটস্ফু।

নাটকের একটি গৌণ চরিত্র হইলেও 'বিশ্বাসী অথচ ধর্মসংস্কারমগ্ন' সেনাপতি নয়ন রায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নয়ন রায় বিশ্বস্ত সরলবুদ্ধি রাজভৃত্য। রঘুপতি যখন তাঁহাকে রাজার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছেন, তখন তিনি বলিয়াছেন—'ধিক্ পাপ পরামর্শ। রঘুপতি তাঁহাকে কুটিল যুক্তিজালের ফাঁদে ফেলিতে চাহিলে বলিয়াছেন—

কি হইবে মিছে তর্কে! বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়ন রায়।

রাজা-কর্তৃক পদচ্যুত হইয়াও এই বিশ্বাস তিনি কোনোদিন হারান নাই। সংকটকালে সকল অভিমান বিসর্জন দিয়া পূর্বতন প্রভুর রক্ষায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তবে ধর্মীয় সংস্কার তাঁহার মধ্যে কিছু বেশি বলিয়া তিনি প্রভুভক্তির উপরে উহার স্থান দিয়াছিলেন। সসৈন্যে মন্দিরে বলি নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন-

ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতা মন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই।

চাঁদপাল 'বিসর্জন'-এর একটি গৌণ চরিত্র। কিন্তু স্বল্প রেখার মাধ্যমেই এই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রটি চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে। লোকটি সুযোগসন্ধানী, পরিস্থিতি বুঝিয়া কথা বলেন অথবা বাক্যহীন হইয়া থাকেন। বলি নিষেধের ব্যাপার শুনিয়া মন্ত্রী, সেনাপতি রাজভ্রাতা সকলেই যখন কিছু না কিছু নিজস্ব মত ব্যক্ত করিলেন, চাঁদপাল তখন চুপ করিয়াই ছিলেন। হয় তো, হাওয়া কোন্‌দিকে ঘুরিতেছে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নক্ষত্রের প্রশ্নে বলিয়াছিলেন---

ভীরু আমি, ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

বস্তুত ইহা তাঁহার সরল রাজভক্তি নয়, সুবিধাবাদী লোকের দ্ব্যর্থক উক্তি। লোকটিকে নয়ন রায় চিনিয়াছিলেন। তাই, পদচ্যুত হইয়া চলিয়া যাইবার মুহূর্তে চাঁদপাল যখন তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'কথা আছে ভাই', তখন নয়ন রায় তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। পরে এই চাঁদপালই রাজার প্রতি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া মোগল-সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন এবং রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। হয় তো তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই ইহার বীজ ছিল। কিন্তু নাটকে যেভাবে উহা দেখানো হইয়াছে, তাহা বড়ই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইতিপূর্বে চাঁদপাল রাজাকে তাঁহার 'প্রাণ-হত্যা তরে গুপ্ত আলোচনা'র কথা খোলা মনেই জানাইয়াছেন—কারণ, 'রাজ-ইষ্টানিষ্ট কিছু না এড়ায় তাঁহার কাছে। মোগল-শিবিরে যাইবার পূর্বেও চাঁদপাল রাজাকে বলিয়াছেন

> মহারাজ! সাবধানে হেথা প্রভু,
> অন্তরে বাহিরে শত্রু।

সুতরাং তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা আকস্মিক মনে না হইয়া পারে না। চরিত্রটির এইরূপ রূপায়ণে পূর্বপ্রস্তুতির অভাব রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মালিনী

একাধারে কাব্যনাট্য ও রোমান্টিক ট্র্যাজেডি 'মালিনী' নাটকের রচনাকাল বাংলা ১৩০৩ সাল। কবির উড়িষ্যা বাসকালে নাটকটি রচিত। এই নাটক রচনাকালে কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র পর্ব পার হইয়া 'চৈতালি' পর্বে পৌঁছিয়াছেন এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' পর্ব অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার মধ্যে লৌকিক আচারধর্মের ঊর্ধ্বে মানবীয় কল্যাণধর্মকে বড় করিয়া দেখিবার একটি ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। এই অনুভূত সত্য বা 'আইডিয়া'কে তিনি ইতিপূর্বে 'রাজা ও রাণী'র এবং বিশেষ করিয়া 'বিসর্জনে'র মধ্যে রূপময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'মালিনী'র মধ্যেও দেখি অন্তর্লোকের সেই ভাবকে রূপবিগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal-এ বর্ণিত 'মহাবস্তাবদান' অধ্যায়ের অন্তর্গত একটি উপাখ্যানকে ভিত্তি করিয়া মালিনীর কাহিনী দানা বাঁধিয়াছে। উহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে কবির স্বপ্নলব্ধ একটি ঘটনা। কবি নিজেই মালিনীর সূচনায় লিখিয়াছেন—

......স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস ক'রে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হ'য়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হ'ল—দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।...অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটকের আকার নিয়ে শান্ত হ'ল।

কবির অন্তরে যাহা ভাব-বাষ্প ছিল, মূল বৌদ্ধ-কাহিনী এবং স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর শৈত্যসংস্পর্শে তাহা জমাট বাঁধিয়া মেঘ হইয়া শেষ পর্যন্ত নিত্য কল্যাণধর্মের করুণাধারায় ঝরিয়া পড়িল। নাটককে এইরকম ভাবের বাহন করিয়া তোলা রবীন্দ্র-নাট্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম।

প্রসঙ্গত নাটকের তাৎপর্যটিও স্মরণীয়। স্বয়ং কবি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি বালক-বয়সে 'প্রকৃতির 'প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম,...তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।...পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে ; অনির্দিষ্ট, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি—

বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে ;
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ ;—দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা' গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব সমর্পণ! ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে।

[মালিনী—৪র্থ দৃশ্য]

'মালিনী' নাটকের সুপ্রিয়-চরিত্রের ভিতর দিয়া কবির এই মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে।

'মালিনী' চারিটি দৃশ্যে বিভক্ত একাঙ্ক নাটক। ইহার পরিসর যেমন সংক্ষিপ্ত, আখ্যানবস্তুও তেমনি সরল। 'সংহত, সংযত' এই নাট্যরূপের প্রতিটি দৃশ্যের তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

প্রথম দৃশ্যের স্থান রাজান্তঃপুর। কাল—অপরাহ্ণ। দৃশ্য-সমাপ্তিতে দেখা যাইতেছে, মহিষী বৈকালের ম্লান আলোকে কন্যা মালিনীর মুখ ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না এবং কেশরচনা করিয়া দিবার জন্য মালিনীকে বাহিরে—সম্ভবত অলিন্দে—লইয়া গেলেন। এই আলো-আধারির মধ্যে আর-একটা আলো-আধারির সূচনা আমরা দেখিতেছি—বৌদ্ধ অর্হৎ কাশ্যপের অনুগ্রহে কাশীর রাজকন্যা মালিনী করুণাঘন বৌদ্ধধর্মের—তথা সত্যধর্মের আস্বাদ লাভ করিয়াছে। অবশ্য তখনও মালিনীর চিত্ত 'সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে আবদ্ধ ভ্রমরী'র মতো, বন্ধনমুক্তি তখনও ঘটে নাই। কাশ্যপ আশীর্বাদ করিলেন—কারামুক্তির দিন মালিনীর জীবনে শীঘ্রই আসিবে। এই বলিয়া কাশ্যপ তীর্থপর্যটনের বাসনা জানাইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মালিনীর মনে এক অভূতপূর্ব আবেগ জাগিল। তাহার মনে হইল, একটা দিব্যভাব যেন তাহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া যেন অদৃশ্য মূর্তিরা আসা-যাওয়া করিতেছে, সমগ্র জগৎ হইতে যেন তাহার নিকট অবোধ্য আহ্বান আসিতেছে। নাটকে 'মালিনী'ই যে কবির করুণা মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমমূলক মানবধর্মের ভাববিগ্রহ—এই দৈবী প্রেরণা বা Revelation-এর মধ্যে উহারই ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি।

এই প্রেরণার সঙ্গে প্রথম মৃদু বিরোধের আভাস পাই—এবং বিরোধই নাটকের প্রাণবস্তু—রাজমহিষীর ঘটনাস্থলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। রাজকন্যা সকল রাজসুখ বিসর্জন দিয়া যৌবনে যোগিনী সাজিবে, মায়ের প্রাণে ইহা সহ্য হয় না। তাছাড়া, অনাদিকালের

সনাতন হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া 'সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া অভিনব' বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ তাঁহার নিকট ভীতির বস্তু। তাঁহার ধারণা—'বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, যাদুবিদ্যা জানে, প্রেতসিদ্ধ তারা।' অধিকন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কূট তর্ক, সন্দেহ, বিশ্বাস—এসকল পুরুষের ব্যাপার। 'রমণীর ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির পতিপুত্ররূপে।' তাই, যে-ধর্ম চিরকালীন, কন্যাকে তিনি সেই ধর্ম আশ্রয় করিতে বলেন—

লহ ব্রত ক্রিয়া কর্ম
ভক্তি ভরে। শিবপূজা কর দিনযামী,
বর মাগি লহ, বাছা, তাঁর মতো স্বামী।

এমন সময় রাজা প্রবেশ করিয়া জানাইলেন, এক 'ঝটিকার মেঘ' আসন্ন এবং উহার হেতু মালিনী। মালিনী নবধর্ম গ্রহণ করিতে চায় করুক, কিন্তু সেকথা বাহিরে প্রকাশ হইবে কেন? রাজান্তঃপুরেই উহা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। রাজকন্যার নবধর্ম গ্রহণের কথা বাহিরে জানাজানি হওয়াতেই সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-দল 'ধর্মনাশ আশঙ্কায়' ক্রুদ্ধ, আর 'প্রজাগণ ক্ষুব্ধ অতিশয়; চাহে তারা নির্বাসন মালিনীর।' এই সংবাদ হইতেই বোঝা গেল, মাতা-পিতা ও কন্যার মধ্যে যে-ধর্মীয় বিরোধ সংকীর্ণ পারিবারিক গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল, তাহা এইবার এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে চলিয়াছে।

রাজমহিষী কিন্তু জননীসুলভ স্নেহে কন্যাকে আড়াল করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণের ধর্মকে 'কাটে-কাটা ধর্ম' বলিয়া ধিক্কার দিলেন। নিজেই তিনি মালিনার নবধর্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া সংকল্প জানাইলেন। মালিনী সম্বন্ধে রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—

এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছে তোমার ঘরে। করিয়ো না হেলা।

'জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে'—একথা মালিনী আগে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এইবার যেন তাহা বুঝিতে পারিল। তাই পিতাকে বলিল—

যারা চাহে নির্বাসন মোর
তারা চাহে মোরে।.........সর্বলোকে
যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির সংসার। জানি না কী কাজ আছে,
আসিয়াছে মহাক্ষণ।

যে দৈব-আবির্ভাব তাহার মধ্যে অস্পষ্ট ছিল তাহা যেন স্পষ্ট হইয়া আসিল, এক দৃঢ় প্রত্যয় জাগিল তাহার মনে। তাহার মনে হইল, অন্ধকার রাত্রে তরঙ্গক্ষুব্ধ নদীতীরে কর্ণাধারহীন একখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তিতীর্ষু যাত্রীরা হতাশ হইয়া বসিয়া আছে ; এই নিরাশার মধ্যে সে-ই আশা দিতে পারে, সে-ই জানে 'তীরের সন্ধান'। এই উপলব্ধিবলেই মা-বাবার কাছে সে বলিল—

বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা,—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।

মালিনীর এই উদ্দীপ্ত বাক্যে মা বিস্মিত হইলেন—'এ কথা কাহার? শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কী বালিকার?' রাজাও বুঝিলেন, মালিনী কোনো পারিবারিক বন্ধনের অধীন নয়।

স্নেহশঙ্কা-ব্যাকুলা মহিষী কেশপ্রসাধন করিয়া দিবেন বলিয়া কন্যাকে লইয়া আলোকিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। এমন সময় সেনাপতি আসিয়া সংবাদ দিল, ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দাবি—রাজকুমারীর

নির্বাসন। ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, 'সামন্ত নৃপতি সবে আন দ্রুতগতি।' উদ্দেশ্য—বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁহাদের সঙ্গে মন্ত্রণা। এইরূপে একটি সংঘাতের উৎকণ্ঠাময় আভাসের মধ্যে প্রথম দৃশ্য শেষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান মন্দির-প্রাঙ্গণ। মালিনীর একটি উক্তি হইতে বুঝা যায়, দৃশ্যের কাল—চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যারাত্রি। কেবল তাহাই নহে, প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে কালগত ব্যবধানও মাত্র কয়েক দণ্ডের।

দৃশ্যটি আরম্ভ হইয়াছে একটি প্রবল উত্তেজনাকর পরিবেশের মধ্যে। প্রথমেই দেখি, মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে নিজেদের সংকল্প ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা সকলেই রাজকন্যার নির্বাসন চান। তাঁহাদের পরিচালক ক্ষেমংকর বয়সে তরুণ। সে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া জানাইল যে, প্রতিপক্ষ একজন নারী, তাই সংকল্পে আরও দৃঢ় হইতে হইবে। কিন্তু ক্ষেমংকরের আজন্ম বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ সুপ্রিয় নির্দোষের এই নির্বাসন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। সে স্পষ্টই জানাইয়া দিল, ধর্মাধর্ম সত্যাসত্যের বিচার দল বাঁধিয়া চীৎকার করিলেই হয় না, উহার মীমাংসা করিতে হয় যুক্তির মাধ্যমে। সুপ্রিয়ের এই প্রতিবাদে ব্রাহ্মণদল ক্ষিপ্ত হইয়া সুপ্রিয়কে 'সভার বাহির' করিয়া দিতে চাহিলেন। সুপ্রিয় বলিল, তথাস্তু। আমি তোমাদের ছায়াও নই, শাস্ত্রবচনের প্রতিধ্বনিও নই। শক্তি যার ধর্ম তার—এই শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নাই। ক্ষেমংকরের কাছে সে বিদায় চাহিল। কিন্তু ক্ষেমংকর তাহাকে বিদায় দিতে চাহিল না। বলিল, 'ঘোর দুঃসময়' আসিয়াছে, এ সময়ে এ বিষয়ে মৌন থাকাই তাহার কর্তব্য। তথাপি সুপ্রিয় 'মূঢ়তার দুর্বিনয়' সহ্য করিতে রাজী হইল না। ক্ষেমংকরকে বলিল—

যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়ে নির্বাসনে
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখ মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করে নি প্রচার,
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার,—
তার বেশি যাহা আছে, প্রমাণ কি তার?

সুপ্রিয়ের এই কথা ক্ষেমংকরকেও মানিয়া লইতে হইল। সেও স্বীকার করিল—মূল ধর্ম একই, আধার বিভিন্ন। 'জল এক, ভিন্ন তটে ভিন্ন জলাশয়!' কিন্তু ইহাও সে বলিতে বাধ্য হইল, চিরকাল ধরিয়া হিন্দু ব্রাহ্মণেরা যে-সরোবরের জলে তৃষ্ণা মিটাইয়াছে, নবধর্মের বন্যা আসিয়া উহার তটভূমি ভাঙিয়া দিবে, ইহাও তো হইতে পারে না। সুপ্রিয়ের অন্তরে উৎস আছে বলিয়া হয় তো সরোবরে তাহার প্রয়োজন নাই। তাই বলিয়া 'সর্বজনতরে সাধারণ জলাশয়' থাকিবে না—'পিতৃধর্ম, প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির আচরিত কর্ম, চিরপরিচিত নীতি' বিসর্জন দিতে হইবে, ইহাই বা কেমন কথা? ক্ষেমংকরের বাক্য সুপ্রিয়ের হৃদয়ঙ্গম হইল না। তবু বন্ধুপ্রীতিবশত এবং ক্ষেমংকরের প্রতি আবাল্য শ্রদ্ধাবশত সে বন্ধুর নিকট নতি স্বীকার করিল—'তব পথগামী চিরদিন এ অধীন।'

এমন সময় উগ্রসেন আসিয়া ক্ষেমংকরকে জানাইল, ব্রাহ্মণদের বাক্যে রাজসৈন্যদল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, উহা যে-কোনো সময়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকারে ফাটিয়া পড়িতে পারে। ব্রাহ্মণদল অবশ্য এতটা আশা করেন নাই, সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে তাঁহাদের জয় হয়, ইহা তাঁহাদের কাম্য নয়। তাঁহারা চান যাগযজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্মতেজের পথে সিদ্ধি। তাই প্রবল উৎসাহে তাঁহারা 'সিদ্ধিদাত্রী

জগদ্ধাত্রী'র আবাহন করিতে লাগিলেন। আর ঠিক সেইক্ষণেই তাঁহাদের সম্মুখে ভিক্ষুণীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইল মালিনী। সকলেই তাহাকে দেবী বলিয়া ভ্রম করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; শুধু করিল না ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়। তবে ব্রাহ্মণেরা জানিতে চাহিলেন, সংহারমূর্তির পরিবর্তে দেবী দয়াময়ী মূর্তিতে কেন আসিয়াছে? মালিনী জানাইল, তাঁহাদের আহ্বানেই সে আসিয়াছে। তাঁহারা তো তাহারই নির্বাসন চাহিয়াছিলেন রাজদ্বারে, তাই স্বেচ্ছায় সেই নির্বাসন সে মানিয়া লইয়াছে। এই কথায় সকলেই তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকন্যা মালিনীই তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত। মালিনীর এই রূপ তাঁহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত। ব্রাহ্মণদল মুগ্ধ হইলেন, অভিভূত হইলেন। এমন দেবীর নির্বাসন চাহিয়াছিলেন বলিয়া নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহারা মালিনীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া রাজগৃহে রাখিয়া আসিতে গেলেন। এতক্ষণ যে-সংঘাত উচ্চ-গ্রামে উঠিয়াছিল, এইখানে তাহা খাদের শান্ত সুরে নামিয়া আসিল।

কিন্তু নাটকের পরিণতি এইখানেই হইতে পারে না, তাই ঘটনাস্থলে রহিয়া গেল ক্ষেমংকর আর সুপ্রিয়। ব্রাহ্মণদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়ও চলিয়া যাইতেছিল, ক্ষেমংকর তাহাকে বাধা দিল। আজন্মের বন্ধুও গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইবে, ইহা তাহার কাম্য নয়। কিন্তু মালিনীর মধ্যে সুপ্রিয় আজ তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধর্মের মূর্তি দেখিতে পাইয়াছে, শাস্ত্রধর্ম অপেক্ষা হৃদয়ধর্ম যে বড় একথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাই ক্ষেমংকরকে সে বলিল—

আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড় কাছাকাছি।

সবার দেবতা তব শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে।……
আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
এ কি গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

ক্ষেমংকর তাহাকে বুঝাইতে চাহিল, যে-দেবতার সন্ধান সে পাইয়াছে, সে মায়া মাত্র, যে-ধর্মের আভাস সে লাভ করিয়াছে, তাহা ছায়া মাত্র—সেদিনকার জ্যোৎস্নারাত্রির সৌন্দর্যের কুহক মাত্র। পরদিবসের সূর্যতাপে ঐ কুহক আর থাকিবে না। সুপ্রিয়ের হৃদয় যে-সৌন্দর্যমোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহাও ঐ জ্যোৎস্নার কুহকের মতো, উহা ধর্ম হইতে পারে না। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়ের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল ভারতের সনাতন ধর্মের গরিমা ও ঐশ্বর্যের চিত্র—বুঝাইল, যত ধর্মদ্রোহী গৃহদ্রোহীর দল আর্যধর্মের মহাদুর্গকে আক্রমণ করিয়াছে, সেই আক্রমণ হইতে দুর্গরক্ষা করিতেই হইবে। সেই ভার ক্ষেমংকর নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। এমন দিনে সুপ্রিয় কি তাহার পাশে দাঁড়াইবে না? বন্ধুত্বের দাবিতে প্রশ্ন করিল—

কথা কও। বল তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে?

আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সুপ্রিয় যে-সত্যধর্মের উপলব্ধি করিয়াছিল, বন্ধুত্বের দুর্বলতার ছিদ্রপথে সেই উপলব্ধি তলাইয়া গেল। দুর্বলচিত্ত সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল। বলিল—

কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

এই আত্মসমর্পণ নাটকের গতিকে আবার তীব্র করিয়া তুলিল। অনিশ্চিত এক সম্ভাবনার দিকে নাটকীয় ঘটনার মুখ ফিরাইয়া দিল। দ্বিতীয় দৃশ্যের এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ইহার পর নাটকে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সবই সুপ্রিয়ের এই দৌর্বল্যজাত দোদুল্যমানতারই ফল।

ক্ষেমংকর তখন সুপ্রিয়কে জানাইল যে, সে দেশান্তরে যাইতেছে। কারণ, যে-বহ্নি 'ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে', বাহির হইতে সৈন্য আনিয়া রক্তস্রোতে সেই বহ্নি নিবাইতে হইবে। কাশীর যে-সৈন্যগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছিল তাহাদিগকেও বিশ্বাস নাই, কারণ বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মতো 'তারাও সকলে দগ্ধপক্ষ পড়িয়াছে সর্ব দলে বলে হুতাশনে।' সুতরাং 'হেথা কোনো আশা নাই আর।'

সুপ্রিয় তাহার সঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্তু ক্ষেমংকর তাহার অনুপস্থিতিতে রাজভবনের সমস্ত সংবাদ পত্রের সাহায্যে জানিবার জন্য সুপ্রিয়কে সঙ্গে লইতে রাজী হইল না। যাইবার পূর্বে সাবধান করিয়া দিয়া গেল—

দেখো সখে,
তুমিও ভুলো না যেন নূতন কুহকে,
ছেড়ো না আমায়! মনে রেখো সর্বক্ষণ
প্রবাসী বন্ধুরে।

এইখানেই দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি। সমাপ্তিটি বিশেষ ইঙ্গিতবহ। কারণ, সুপ্রিয় 'নূতন কুহকে' ভুলিবে কি না, এবং 'প্রবাসী বন্ধুরে' কিভাবেই বা সে স্মরণে রাখিবে, সমাপ্তিটি—এই ঔৎসুক্যই জাগাইয়া তুলে।

তৃতীয় দৃশ্যের স্থান অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যেও কালের ব্যবধান খুব বেশি নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে যে-ব্রাহ্মণগণ মালিনাকে রাজগৃহে ফিরাইয়া দিতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তৃতীয় দৃশ্যে প্রায় প্রারম্ভেই তাঁহারা মালিনাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন।

মালিনী মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে ঘরে না দেখিয়া মহিষী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই ঘটনার উপস্থাপনা দ্বারা তৃতীয় দৃশ্যের শুরু। এমন সময় সেখানে প্রবেশ করিলেন রাজা ও যুবরাজ। যুবরাজ জানাইলেন—সৈন্যগণ, নগর-প্রহরীরা সকলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মালিনীকে শীঘ্র নির্বাসন না দিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ। রাজাও স্থির করিলেন, রাজধর্ম রক্ষার জন্য অগত্যা উহা করিতেই হইবে। কিন্তু মহিষীর মুখে যখন শুনিলেন যে, মালিনীকে রাজগৃহে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তখন রাজা কন্যাস্নেহে ব্যাকুল হইলেন। ইহার উপর মহিষী যখন আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, প্রজারা মিলিয়াই হয় তো মালিনীকে চুরি করিয়াছে, তখন রাজাও তাহার দৃঢ় সংকল্প জানাইলেন---

প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
কোলের কন্যারে মোর। রাজ্যে ধিক্ থাক্।
ধিক্ ধর্মহীন রাজনীতি। ডাক্, ডাক্
সৈন্যদলে।

যুবরাজ চলিয়া যাইতেই, সৈন্যগণ সহ রাজ্যের প্রজারা জয়ধ্বনি করিতে করিতে মালিনীকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মহিষী ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। প্রজারা মালিনীর কাছে অনুরোধ জানাইল, মালিনী যেন তাহাদের ভুলিয়া না থাকেন। মালিনীও প্রজাদের বলিল—

তোমরা যেয়ো না দূরে
এসেছ যাহারা। প্রতিদিন রাজপুরে
দেখা দিয়ে যেয়ো! সকলেরে এনো ডাকি,
সবারে দেখিতে চাহি আমি। হেথা থাকি
রব আমি তোমাদেরি ঘরে পুরবাসী।

প্রজারা ধন্য ধন্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। গুরু কাশ্যপ মালিনীকে তাহার জীবনে আসন্ন যে-মহালগ্নের কথা বলিয়াছিলেন, সেই লগ্ন তাহার জীবনে আসিয়াছে বলিয়া মালিনীর এক পরম উপলব্ধি ঘটিল। মাকে সে বলিল—

মা আমার
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকাতে।
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক,—দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।

কন্যাস্নেহাতুরা মাতা অতশত কথা বুঝেন না। কন্যা তাঁহার কাছে থাকিলেই তিনি খুশী। কন্যা যদি 'বিশ্বপ্রাণ' হইতে চায় হোক, কিন্তু বাহিরে গিয়া নয়—বৃহৎ সংসারকে সে অন্তঃপুরেই আহ্বান করিয়া আনুক।

নব আবির্ভাবের জন্য মালিনীর মধ্যে যে-উত্তেজনার কম্পন জাগিয়াছিল, মাতার স্নেহচ্ছায়ার স্পর্শে যেন উহা ধীরে ধীরে থামিয়া আসিল, অবসন্ন দেহ তখন চাহিল মাতৃক্রোড়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রা। মাতৃস্পর্শে মালিনী শীঘ্রই নিদ্রাভিভূতা হইল। এতক্ষণে মায়ের একান্ত স্নেহের রূপটি পরিস্ফুট হইল। রাজার নিকট তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল, নবধর্মের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণও নাই! তিনি বলিলেন—

মহারাজ, সাবধান হও এই বেলা।
নবধর্ম নবধর্ম কারে বল তুমি ?
কে আনিল নবধর্ম, কোথা তার ভূমি
আকাশকুসুম ? কোন্ মত্ততার স্রোতে
ভেসে এল—কন্যারে মায়ের কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়—ধর্ম বলে তায় ?
তুমিও দিয়ো না যোগ কন্যার খেলায়,
মহারাজ।

রাজাকে তিনি অনুরোধ করিলেন—মালিনীর জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করিতে। মহিষীর কামনা, সেই সভায় মালিনী—

মনোমত বর দেখে'
খেলা ভেঙে' যোগ্য কণ্ঠে দিক্ বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা।

এইখানেই তৃতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি। আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যটি একটি স্বস্তির বা relief-এর মধ্যে শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রথম দৃশ্যে যে-সংঘাত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, এই দৃশ্যে সংঘাতের এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আমাদের কৌতূহল এইখানেই শেষ হয় না। ক্ষেমংকর-সংশ্লিষ্ট ঘটনার অপেক্ষায় অধিকতর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং এই আপাতশান্তি ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি এবং এইখানেই তৃতীয় দৃশ্যের সমাপ্তির তাৎপর্য।

চতুর্থ এবং 'মালিনী' নাটকের শেষ দৃশ্যের স্থান রাজ-উপবন। দৃশ্যের সংলাপ বা ঘটনা হইতে দৃশ্যের কাল বুঝিবার উপায় নাই। তবে মনে হয়, কালটি দিবাভাগের কোনো সময় হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে কালগত

ব্যবধান অনেকখানি। কারণ, দৃশ্যারম্ভের ঘটনায় বুঝা যাইতেছে—মালিনী ও সুপ্রিয়ের চরিত্রের যেমন বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তেমনই ইতিমধ্যে অনেক ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে।

রাজ-উপবনে পরিচারিকাবেষ্টিতা মালিনীর সঙ্গে সুপ্রিয়ের কথা-বার্তার ভিতর দিয়া চতুর্থ দৃশ্যের শুরু। এখানকার সংলাপ হইতে বুঝা যায়, মালিনীর সঙ্গে কিছুকাল ধর্মালোচনার সূত্রে সুপ্রিয়ের চিত্ত শুধু যে নবধর্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই জ্যোতি তাহার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই মালিনীও তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—সে মালিনীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছে। স্পষ্টত এই কারণেই সুপ্রিয় চাহিয়াছে মালিনীর হাতে তাহার জীবনের সমস্ত ভার তুলিয়া দিতে।

দেবি, লহ মোর ভার।
যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে, সব তর্ক করি পরিহার,
নীরব ছায়ার মতো দীপবর্তিকার।

মালিনীর মনেও যে সুপ্রিয় সম্পর্কে কোনো নূতন অনুভূতি জাগে নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তাই তাহাকে বলিতে শুনি—

হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা।

মালিনীর মনে হয়, সুপ্রিয় সে-ই আসিল, কিন্তু আগে আসিল না কেন? কারণ, বিশ্বে বাহির হইয়া আজ মালিনীর মনে ভয় জাগিতেছে; মনে হইতেছে, সে বড়ই একাকিনী। মনে হইতেছে—'সহস্র সংশয়, বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ

ক্ষণিকের তরে আসে।' মালিনীর জীবনে যে, দিব্য-প্রেরণার আবির্ভাব হইয়াছিল উহা আজ আর নাই, 'আজ সে ঐশী শক্তি প্রভাবিতা কেহ নয়, আজ সে নিতান্তই একজন মানবী। তাই 'অকারণ অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন কী জানি কী বেদনায়!' তাই সে সুপ্রিয়কে প্রশ্ন করিল, 'তুমি মোর বন্ধু হবে।' বেশ বোঝা যাইতেছে, মালিনী ও সুপ্রিয় উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট।

এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া জানাইল, প্রজারা মালিনীর দর্শন কামনা করিতেছে। কিন্তু মালিনী বলিল--

আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার। আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা।

ইহার পর আর সন্দেহ থাকে না যে, 'লোকমাতা' হইবার প্রতি মালিনীর আগ্রহ নাই, এক্ষণে সে প্রণয়িনী।

প্রতিহারী চলিয়া গেলে, মালিনী সুপ্রিয়ের মুখ হইতে ক্ষেমংকরের কথা জানিতে চাহিল। সুপ্রিয় উত্তর দিল, ক্ষেমংকর শুধু তাহার বান্ধব নয়, সে তাহার—

বন্ধু, ভাই,
প্রভু! সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ। বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটল চিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষোমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে।

কিন্তু সেই চিরন্তন বন্ধুকেই সুপ্রিয় ডুবাইয়াছে। মালিনী সচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডুবায়েছ তারে?' ইহার উত্তরে সুপ্রিয় যে-কাহিনী বলিয়া গেল তাহা এই—যেদিন নবধর্মবিদ্বেষী উদ্ধত বিদ্রোহীর দল মালিনীর কাছে নতি স্বীকার করিয়াছিল, সেদিন একমাত্র ক্ষেমংকরই ছিল সংকল্পে অচল অটল। বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া নবধর্ম বিলোপ করিবার সংকল্প লইয়া সে দূর দেশান্তরে চলিয়া গেল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে, মালিনীর তাহা অজানা নাই। মালিনীর সান্নিধ্যে সে এক 'নবজন্মভূমি' লাভ করিয়াছে, উহার ভিত্তি 'সর্বজীবে দয়া'। সে উপলব্ধি করিয়াছে, আত্মাভিমান বলি দিয়া ভালোবাসিতে হইবে, বিশ্বের বেদনা আপনার বেদনা বলিয়া অনুভব করিতে হইবে, কারণ 'যে কিছু বাসনা শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।' যাগ-যজ্ঞ-তপস্যায় মুক্তি নাই, 'মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে'।

একদিন সে ক্ষেমংকরের নিকট হইতে পত্র পাইল উহাতে সে লিখিয়াছে—রত্নবতী নগরীর রাজগৃহ হইতে সৈন্য লইয়া সে কাশীতে আসিতেছে, রক্তস্রোতে নবধর্ম বিলোপ করিয়া সে আবার সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবে এবং নবধর্মের আশ্রয়স্থল মালিনীর প্রাণদণ্ড দিবে। মালিনীর প্রাণনাশের আশঙ্কা সুপ্রিয়কে বিহ্বল করিয়া তুলিল, বন্ধুত্বের পুরাতন বন্ধন এক নিমেষেই ছিন্ন হইল। রাজাকে সে সেই পত্র দেখাইয়াছে। মৃগয়ার ছলে রাজা গোপনে রাজসৈন্যদল লইয়া ক্ষেমংকরকে আক্রমণ করিতে গিয়াছেন। কিন্তু বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সুপ্রিয়ের অন্তর আজ অনুতপ্ত, তাই সে বলিল—'আমি হেথা লুটাতেছি পৃথ্বীতলে—আপনার মর্মে ফুটাতেছি দন্ত আপনার।'

ক্ষেমংকর মালিনীর প্রণয়ীর বন্ধু, তাই মালিনী ক্ষেমংকরের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া উঠিল। বলিল—

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্য সাথে? এ ঘরে সে প্রবেশত আসি'
পূজ্য অতিথির মতো— চিরপ্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে যাব।

এমন সময় রাজা প্রবেশ করিয়া জানাইলেন, সুপ্রিয়ের নিকট হইতে যথাসময়ে সংবাদ পাইবার ফলেই ক্ষেমংকরকে তিনি অনায়াসে বন্দী করিতে পারিয়াছেন। সুপ্রিয়ের বান্ধবজনোচিত কার্যে খুশী হইয়া রাজা তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, কিন্তু সুপ্রিয় তাহা গ্রহণ করিল না। রাজা বলিলেন, শুধু রাজ-আলিঙ্গনই যে সুপ্রিয়ের পুরস্কার তাহা নয়, তিনি তাহাকে যে-কোনো ঐশ্বর্য দান করিবেন। এমন কি, রাজ্যখণ্ডও তাহাকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু ঐ সকলের কিছুই সুপ্রিয়ের প্রার্থনীয় নয়। সে জানাইল যে, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে। রাজা ভাবিলেন, সুপ্রিয় সম্ভবত মালিনীর পাণিপ্রার্থী, কিন্তু সংকোচবশত তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তখন তিনি মালিনীকেই তাহার হাতে সমর্পণের কথা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের নিকট উহা কাম্য হইলেও, সে আজ তাহাও চাহে না। কারণস্বরূপ বলিল—

রাজহস্ত হতে পুরস্কার!
কে করেছি? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়—। ... ...
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্ণলোক
চাহি না লভিতে।

মালিনীর মধ্যে যে-মানবী মন সুপ্রিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল উহাই তখন স্বগতভাবে বলিয়া উঠিল —

ওরে রমণীর মন
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায় !

প্রকাশ্যে মালিনী রাজার নিকট জানিতে চাহিল, তিনি বন্দীর কী বিচার করিয়াছেন। রাজা জানাইলেন যে, ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ড হইবে। মালিনী তখন রাজাব নিকট ক্ষেমংকরের প্রাণভিক্ষা চাহিল। রাজা উহাতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহার আগে একবার ক্ষেমংকরের বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিযা দেখিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাজার এই ইচ্ছা নাটকের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ঐ ইচ্ছার সূত্র ধরিয়াই আসন্ন হইল নাটকীয় বিষাদান্তক পরিণতি।

যাহা হউক, রাজা সেই সঙ্গে সুপ্রিয়কে ইহাও জানাইলেন যে, সে তাহার বন্ধুকে ফিরিয়া পাইবে। উহাতেই তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন না, সুতরাং সে রাজার হৃদয়ের সর্বোত্তম রত্ন মালিনীকে গ্রহণ করুক। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে মালিনীর কপোল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। রাজা বুঝিলেন—

আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে !

রাজাদেশে প্রতিহারী শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষেমংকরকে লইয়া উপস্থিত হইল। তখন ক্ষেমংকরের—

নেত্র স্থির, ঊর্ধ্বশির, ভ্রুকুটির 'পরে
ঘনায়ে রয়েছে ঝড়, হিমাদ্রি শিখরে
স্তম্ভিত শ্রাবণ সম।

ক্ষেমংকরকে দেখিয়া রাজার এই উক্তিটি আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিতবাহী।

রাজা ক্ষেমংকরকে বলিলেন যে, তাহার মৃত্যুদণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু যদি তাহাকে ক্ষমা করা হয়, তবে সে কী করিবে? ক্ষেমংকর বলিল—

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার,—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।

রাজা তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে যদি তাহার কিছু প্রার্থনা থাকে, তাহাও করিতে বলিলেন। ক্ষেমংকর জানাইল, 'বন্ধু সুপ্রিয়েরে শুধু দেখিবারে চাহি।'

রাজা যখন সুপ্রিয়কে তাঁহার হৃদয়ের সর্বোত্তম রত্ন দানের কথা বলিয়াছিলেন, তখনই সুপ্রিয় রাজানুরোধে ঘটনাস্থল ত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার আদেশেই প্রতিহারী সুপ্রিয়কে সেখানে লইয়া আসিল। সুপ্রিয় প্রবেশ করিয়াই ক্ষেমংকরকে আলিঙ্গন করিতে গেল, কিন্তু ক্ষেমংকর উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল—

আমার বিচার হল শেষ—আমি চাই
তোমার বিচার এবে। বল মোর কাছে
এ কাজ করেছ কেন?

সুপ্রিয় উত্তর দিল—

বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহার বিশ্বাস,
প্রাণসখে, ধর্ম সে আমার।

ক্ষেমংকর শ্লেষভরে বলিল, জানি কে তোমার ধর্ম। তোমার ধর্ম ঐ রাজকন্যা। উহারই মোহে তুমি পিতৃধর্ম বিসর্জন দিয়াছ।

সুপ্রিয় অস্বীকার করিল না, বলিল—

সত্য বুঝিয়াছ সখে!
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধ'রে'! শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবন-বিহীন;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রলিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।

ক্ষেমংকর বলিল, মালিনীকে প্রথম দেখিয়া তাহার মধ্যেও ঐরূপ মোহ জাগিয়াছিল। তথাপি সেই মোহবন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া সে কর্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, শত অপমান সহ্য করিয়াছে, আবাল্য বন্ধুর বিরহ সহ্য করিয়াছে। আর সুপ্রিয়? যখন সিদ্ধি প্রায় করতলগত, তখন রাজগৃহে সুখালসে মনের মতো ধর্ম সৃজন করিয়াছে। সুপ্রিয় বলিল, বৃহৎজগতে অসংখ্য জন, অসংখ্য ধর্ম, সকলেই সহাবস্থান করিতেছে; ক্ষেমংকরও তেমনি পাশাপাশি একাধিক ধর্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লউক। কিন্তু অসহিষ্ণু ক্ষেমংকর মিথ্যা বাগ্‌বিস্তার করিতে চাহিল না। বলিল—উদারতা এত উদার নয় যে, চিরকালীন বন্ধুত্বের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতাকেও সে ক্ষমার চক্ষে দেখিবে। সত্য-মিথ্যা বিচারের প্রয়োজন আর নাই, তার চেয়ে এসো—

সকল সংশয়
আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে,
দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
দুই সখা, লয়ে দুজনের প্রশ্ন যত।

সব চেয়ে বড আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখ মৃত্যুর সম্মুখে।

সুপ্রিয় ইহাতে রাজী হইল। ক্ষেমংকর বলিল—

এস তবে এস বুকে।
বহুদূরে গিয়েছিলে এস কাছে তবে
যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহ তবে বন্ধু-হস্তে করুণ বিচার—
এই লহ।

অতঃপর সুপ্রিয় কাছে যাইতেই সে সুপ্রিয়ের মাথায় হাতের লোহার শিকল দিয়া সজোরে আঘাত করিল। সুপ্রিয় মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। মৃত্যুর পূর্বে সে কেবল মালিনীকে বলিয়া গেল, 'দেবি, তব জয়!' ক্ষেমংকর সুপ্রিয়ের মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে ডাকিতে বলিল। রাজাও শীঘ্র খড়্গ আনিতে আদেশ দিলেন। মালিনী তখন রাজার কাছে ক্ষেমংকরের জন্য ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন জানাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। এমনিভাবে এক ধর্মীয় সংঘাত নিয়তি-তাড়নায় অকস্মাৎ এক মর্মান্তিক বিষাদান্তক পরিণতিতে সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ এক বিশিষ্ট অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মভাবনার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহু কাব্যে ও নাটকে উহার স্বাক্ষর বর্তমান। কোনো সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ধর্মকে তিনি কোনোদিনই আদর্শ করিতে পারেন নাই, সংকীর্ণ কোনো ধর্মের বন্ধনকে স্বীকারও করেন নাই। শাস্ত্রের শাসনবিহীন উদার ধর্মমতের তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। যে-ধর্ম সকল দেশের, সকল মানুষের মিলনের পরিপন্থী তাহা তাঁহার মনের অনুকূল ছিল না। যে-ধর্ম ভেদের গণ্ডি টানে, সকল মানুষকে

অবিচ্ছেদ্য কোনও ঐক্যের সূত্রে বাঁধিতে পারে না, যাহা হিংসা বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয়, যাহা শান্তি ও মৈত্রীর পরিপন্থী, সেরূপ ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন প্রকৃত ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কাম্য ছিল, নিত্যধর্ম ও সত্যধর্ম।

অখণ্ড শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মই মানুষের সত্যধর্ম। ইহা মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্ম পৃথিবীতে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে বিগলিত করে। যে-ধর্ম মানুষের অন্তরকে উদার মহৎ করে, যে-ধর্ম মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা উৎসারিত করে, তেমনি এক ধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অহিংসা, সেবা, মৈত্রী এরূপ ধর্মের বিশিষ্ট লক্ষ্য। এই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে না ; তাহারা শুধু অখণ্ড ঐক্যকে চিনে। মানুষে মানুষে প্রীতি-প্রেমের সম্বন্ধটাকেই তাহারা চরম সত্য বলিয়া জানে।

রবীন্দ্রনাথ যে নিত্যধর্ম ও সত্যধর্মের কথা তাহার বিভিন্ন কাব্য-নাটকে বলিয়াছেন, তাহার সহিত আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভেদ রহিয়া গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিচারবর্জিত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ ধর্মে নানা অর্থহীন সংস্কার জন্ম লয়। ইহাতে আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ সর্বস্ব হইয়া উঠে। উহা মানুষকে বন্ধন-মুক্তির গান শুনাইতে পারে না, মানুষকে সীমা হইতে অসীমে উত্তীর্ণ করিতে পারে না – মানুষকে মহৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। উহা মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা না করিয়া মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া তুলে। তখন সমাজে ও রাষ্ট্রে শুরু হয় অন্তহীন বিরোধ, তখন মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়, লোকাচার ও জীর্ণ সংস্কার মানুষের উন্নতি-সমৃদ্ধির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে বটে আত্মার মহতী বিনষ্টি।

'বিসর্জন' (১২৯৭) নাটকের রচনাকাল হইতেই কবির রচনায় সত্যধর্ম বা মানব-ধর্মের সঙ্গে লৌকিক বা আচারগত ধর্মের সংঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। 'মালিনী' নাটকেও কবিগুরু তাঁহার ধর্মবোধের আদর্শকেই রূপায়িত করিয়াছেন। এই নাটকের দ্বন্দ্ববস্তুই হইতেছে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের সহিত বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব। 'মালিনী' নাটকের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে—যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম, ব্রত-উপবাসই কি কেবল ধর্ম? সর্বজীবে প্রেম ও দয়াধর্ম কি তবে সত্যধর্ম নয়? 'মালিনী' নাটকের দ্বন্দ্ব শাস্ত্রধর্মের সহিত হৃদয়ধর্মের বা মনুষ্যত্ব-ধর্মের দ্বন্দ্ব।

'মালিনী' নাটকের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না। সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব সে নয়, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণে থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।··· এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতঃই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা—সেইটেতেই এর কাব্যরস।

এই করুণা ও মৈত্রীতে পরিপূর্ণ সত্যধর্মের প্রতীক হিসাবে নাটকে 'মালিনী'-চরিত্রের অবতারণা। এই চরিত্রটি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব হিন্দুধর্মের পরিবর্তে করুণা, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্মের সমর্থন-কারিণীরূপে আবির্ভূতা। ঐ ধর্মের মূল নীতিসমূহের

অনুসারিণী সে। জগতের দুঃখ দূর করার জন্য তাহার অন্তরে একটা দিব্যপ্রেরণা কাজ করিয়াছে। তাই সে বলে—

মহাক্ষণ আসিয়াছে। অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল
পদ্মদলে। নেত্র মুদি' শুনিছে কানে
আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে
কি করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মূরতি!......................
জগতে কাহারা যেন ডাকিছে আমারে।

মালিনা দুঃখপীড়িত জগৎকে সান্ত্বনার সুধা দান করিবার জন্য উৎসুক, পরের মঙ্গলকল্পে নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত। জনতার সম্মুখে তাই সে বলে—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে।

লৌকিক ধর্ম অহংসর্বস্ব পরমত-অসহিষ্ণু। মহিষীর মুখে আমরা সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

ধর্ম জানে ব্রাহ্মণ কেবল?
আর ধর্ম নাই; তাদেরি পুঁথিতে লেখা
সর্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার রেখা
এ বিশ্বসংসারে?

আচার-বিচার অথবা বিরুদ্ধধর্মীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ যে ধর্ম নয়, সুপ্রিয়ের যুক্তির মাধ্যমে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—

যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসন
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখ মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার;—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম; সর্বধর্মে সেই সার।

আবার অন্যত্র—

স্বর্গ আছে কোন্ পুরে
কোথায় দেবতা—কেবা সে সংবাদ জানে!
শুধু জানি বলি দিয়া আত্মঅভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো—বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে,—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়—
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে।

এই সত্যধর্মের বিরোধী ক্ষেমংকর। সে আচারধর্মের প্রতীক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহার মধ্যে ছিল বজ্রদৃঢ় প্রত্যয়। আর মালিনীর মধ্যে করুণা মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেম প্রচারের প্রবল প্রেরণা—পৃথিবীবাসীকে মৈত্রীবন্ধনে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা। নাটকের শেষে রাজা যখন ক্ষেমংকরের প্রাণবধের জন্য ঘাতককে খড়্গ আনিতে আদেশ দিলেন, তখন মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিবার আবেদন জানাইয়াছে রাজার নিকট। এই আবেদনের ভিতর দিয়া শত্রুর

প্রতি মহতী ক্ষমাস্বরূপ নিত্যধর্মের অন্যতম লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত নাটকে আচারধর্মের উপর হৃদয়ধর্মের বিজয়াভিষেক হইয়াছে। নাটকে হিংসার তাণ্ডবকে প্রেম ও অহিংসার স্নিগ্ধ শীতল ধারায় অভিষিক্ত করা হইয়াছে।

এই নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়। পূর্বে 'মালিনী'র 'সূচনাংশ' হইতে যে-উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, উহারই পরবর্তী অংশে আছে—

এই ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির প্রতিশোধে, সেকথা ভেবে দেখবার যোগ্য।

কবির এই উক্তি স্মরণ করিলে, মালিনী যে একাধারে দেবী ও মানবী তাহা বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি 'মালিনী'-চরিত্রে মানবীয় ভাবের উন্মেষের কারণটি বুঝাইয়া দিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া মুক্তি চাহিয়াছিল। কিন্তু চিত্তনিরোধ কখনও শুভ হয় না, প্রকৃতি তাহার পরিশোধ নেয়। সন্ন্যাসীকেও তাই কন্যাস্নেহের ভিতর দিয়া "হৃদয়ের পথ দিয়া প্রকৃতি আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস-দরবারে লইয়া গিয়াছিল।" —"মানব-প্রকৃতিকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে ক্ষুধিত রাখিয়া, সেই শূন্যতার উপর মহত্তর জীবনের বেদী রচনা করিতে গেলে অকস্মাৎ তাহা ধ্বসিয়া পড়ে, মালিনী নাটক হইতে এই ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়।" নাটকের "প্রথম অংশের মালিনী মানব-প্রকৃতির দাবি এড়াইয়া নবধর্মের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল। নাটকের শেষ অংশে প্রকৃতি তাহার বলি সংগ্রহ করিয়াছে।" নাটকের প্রথমাংশে সে অলৌকিক—যেন দূর স্বর্গের সন্ধ্যাতারা। ঊর্ধ্বলোক হইতে সে মঙ্গল-মাধুর্য বিকিরণ করিতে চাহিয়াছে। সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার

মধ্যে অন্তহীন ব্যাকুলতা জাগিয়াছে। কিন্তু নাটকের শেষে সে মানবী। 'মহারাজ ক্ষম ক্ষেমঙ্করে !'—এই উক্তির ভিতর দিয়া "রমণীর মনে যে ক্রন্দন উঠিল, তাহা প্রধানত রমণীজনোচিত করুণার ক্রন্দন।"

'মালিনী' নিঃসন্দেহে একটি ট্র্যাজেডি। কারণ, ইহার পরিণতি বিষাদময়, নায়কের মৃত্যুর মধ্য দিয়া উহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু ট্র্যাজেডি সম্পর্কে উহাও বড় কথা নয়। আধুনিক ট্র্যাজেডির পরিণতিতে মৃত্যু থাকে না। দুঃখপূর্ণ পরিসমাপ্তি হইলেই উহা ট্র্যাজেডি বলিয়া পরিগণিত হয়।

'মালিনী'র ট্র্যাজেডিকে প্রাচীন ট্র্যাজেডির আদর্শেই বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন ট্র্যাজেডির দুই ভাগ—গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডি। গ্রীক ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গের প্রধান লক্ষণ হইল স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য। অর্থাৎ, নাটকের স্বসম্পূর্ণ ও সামগ্রিক একটি ঘটনা একটিমাত্র স্থানে একদিনের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে। গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্তরঙ্গের প্রধান লক্ষণ—সেখানে নিয়তিনিগ্রহ বা কোনো মহাপাপের ফলস্বরূপ নায়কের পতন বা মৃত্যু ঘটে। সেখানে নাটকীয় ঘটনা এমনভাবে উপস্থিত করা হয় যে, নায়ক তাহার আসন্ন পতন বা মৃত্যু সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিলেও দর্শকগণ আগে হইতেই উহা বুঝিতে পারিয়া নায়কের জন্য দুঃখবোধ করেন। উপরন্তু, সেই নাটক এমন কোনো ভয়ানক ঘটনার মধ্য দিয়া শেষ হয়, যাহার রসপরিণামে মনে করুণা ও আতঙ্ক জাগে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ দর্শকদের মন হইতে পাপবাসনা দূরীভূত হয়। ইহাকেই বলা হইয়াছে 'Catharsis' বা বিমোক্ষণ।

শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গের প্রধান লক্ষণ হইল—উহার

বহুদৃশ্যসমন্বিত পঞ্চাঙ্ক বিভক্তি। উহাতে সমগ্র কাহিনীরই বিস্তৃতি থাকে। উপস্থাপনা হিসাবে নাটকের প্রথমেই থাকে বিরোধের বীজ, মধ্যাংশে উহাই উঠে তীব্রতম পর্যায়ে বা climax-এ এবং উহার পর নাটক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। ঐরূপ ট্র্যাজেডির অন্তরঙ্গ লক্ষণ হইল, উহাতে নায়কের মৃত্যুর মূলে থাকে তাহার চরিত্রের আন্তর্নিহিত দুর্বলতা বা 'inherent weakness of character'।

এক্ষণে ঐ দুই আদর্শের ট্র্যাজেডির আলোকে 'মালিনী'র বিচার করা যাক।

মালিনীর 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড বাসকালে গ্রীকসাহিত্যের রসজ্ঞ ট্রেভেলিয়ান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে. 'মালিনী'তে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখিয়াছেন। বহিরঙ্গে 'মালিনী' কিছুটা গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার দৃশ্যভাগ বহুল পরিমাণে সংহত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।" গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো 'মালিনী' অবশ্য সুপ্রিয়-হত্যার ন্যায় ভয়ানক ঘটনার মধ্য দিয়াই শেষ হইয়াছে, কিন্তু 'মালিনী'র রসপরিণাম সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রীক নাটকে মহাপাপের ফলস্বরূপ ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। 'মালিনী'-তেও অবশ্য বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারূপ পাপের ফলেই সুপ্রিয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু ঐ ঘটনার পরেও মালিনীর উপলব্ধ নবধর্মের অন্যতম লক্ষণ ক্ষমাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ পুণ্য-প্রভাবকেই জয়ী করা হইয়াছে।

গ্রীক ট্র্যাজেডি সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন ধারায়

অবিসর্পিল ও অনিবার্য গতিতে অতি দ্রুতবেগে একটা পরিণাম-দারুণ মুহূর্তের দিকে আগাইয়া চলে। নিরুপায় নায়ক একান্ত অসহায় যূপবদ্ধ বলির পশুর মত নিয়তি-নির্ধারিত পরিণাম বহন করিতে বাধ্য হয়। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের মর্মান্তিক পরিণামের মধ্যে এই অনিবার্যতা আছে।

গ্রীক নাটকে শুধু স্থানগত ঐক্যকেই অক্ষুণ্ণ রাখা হয় না, নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোনরূপ দৃশ্যান্তর সেখানে থাকে না, কালগত কোনরূপ ছেদ তারই ফলে সৃষ্টি হয় না। গ্রীক নাটকে কালগত দূরত্ব যদি বা সৃষ্টি করার প্রয়োজন ঘটিত, তবে তাহার জন্য অল্পসময়ের জন্য মঞ্চ শূন্য থাকিত—সেই সময়ে কোরাস-দল মঞ্চের উপর উপস্থিত থাকিত। গ্রীক নাটকে ঘটনা ও সংলাপ-স্রোতে সামান্যমাত্র বিরতি দেখানো হইত।

ঘটনার ঐক্য-বিধান বিষয়ে গ্রীক নাট্যকারেরা অতিশয় সচেতন ছিলেন। এরিস্টটল বলিয়াছেন—action one and complete, এজন্যই ঘটনাসৃষ্টির ব্যাপারে গ্রীক নাটকে কোনরূপ শাখাপ্রশাখার বিস্তার প্রশ্রয় পইত না। এরিস্টটল শাখা-কাহিনীকে স্বাতন্ত্র্য দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্থান কাল এবং ঘটনাগত ঐক্যবিধান করিয়া গ্রীক নাট্যকারেরা অতিশয় নিবিড় ও সংহত একটা আবেদন সৃষ্টি করিতেন। গ্রীক নাটকের কোথাও কিছুমাত্র শিথিলতা, অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস বা আবেগের অতিরিক্ত প্রাধান্য থাকিত না। ঐক্যের আবেদনেই গ্রীক নাটক বিশিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর মালিনী নাটক সেক্সপীয়রের আদর্শে রচিত—গ্রীক প্রভাব তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল, একথা

তিনি নিজেই বলিয়াছেন। সেক্সপীয়রের নাটকে যে ধরনের বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত—তাহাকেই তিনি তাঁহার নাটকে অনুসরণ করিয়াছেন, এ স্বীকারোক্তিও রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। তবু মালিনী নাটকে যে কিছুটা গ্রীক নাট্যরীতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহা না মানিয়া উপায় নাই। নাট্যবস্তুতে স্থানগত, কালগত এবং ঘটনাগত নিবিড় ছেদহীন ঐক্য থাকিবে—ইহাই ছিল গ্রীক নাটকের আদর্শ। 'মালিনী' নাটকে কোন অঙ্কবিভাগ না থাকায়, এখানে কোন বড় রকমের বিরতি নাই। মালিনীতে একটা সংহতি স্পষ্টতই চোখে পড়ে। নাটকে চারিটি দৃশ্য আছে। প্রথম দৃশ্য—রাজান্তঃপুর। দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণ। তৃতীয় দৃশ্য—অন্তঃপুর। চতুর্থ দৃশ্য—রাজ-উপবন। নাটকে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে স্থানগত ঐক্য আছে। এই তিনটি দৃশ্যই মূলত রাজান্তঃপুর—রাজান্তঃপুরস্থ কক্ষ অথবা উপবন। এই তিনটি দৃশ্যের ঘটনা রাজান্তঃপুরেই ঘটিয়াছে একথা বলা চলে। গ্রীক নাটকের ধারায় এই তিনটি দৃশ্যকে বলা যায়—'রাজান্তঃপুর এবং রাজান্তঃপুরের উপবনের সন্নিহিত অলিন্দ বা প্রাঙ্গণ।' কিন্তু নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যটি স্থানগত ঐক্যের পরিপন্থী। সেখানে নাট্যকার তাঁহার নাটকের ঘটনাস্রোতকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে লইয়া গিয়াছেন। কাজেই ঐ দ্বিতীয় দৃশ্যের জন্য নাটকের স্থানিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কালগত ঐক্যের ক্ষেত্রে গ্রীক নাটকের নিবিড়তা মালিনীতে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাপুরি নয়। প্রথম তিনটি দৃশ্যের ঘটনাকাল খুবই নিকটবর্তী। প্রথম দৃশ্যে রাজার আগমন এবং তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মণদের উত্তেজনা ও মালিনীর নির্বাসন-দাবির সংবাদ-প্রদান। সে সংবাদে মালিনী স্বেচ্ছায় নির্বাসন

মাথা পাতিয়া লইয়াছে। বিরুদ্ধ প্রজাদের সঙ্গে সে মিলিত হইতে চাহিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাকাল প্রায় একই সময়ের। প্রজাদের উত্তেজনা এবং অভিনন্দনে ধন্য মালিনীর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন। প্রথম দৃশ্য হইতে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত নাটকের ঘটনাধারা দ্রুত প্রবাহিত। কালগত ব্যবধানও খুব অল্প। কাজেই কালগত ঐক্য নাটকের প্রথমাংশে পুরাপুরি রক্ষিত। গ্রীক নাটকের সঙ্গে ইহার তুলনা চলে। কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যে কালগত ঐক্য ভাঙিয়াছে।

ঘটনাগত ঐক্যের দিক হইতে মালিনীতে গ্রীক রীতি। মালিনীর নবধর্মচেতনায় ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহচেষ্টা, মালিনীর আবির্ভাবে সেই বিদ্রোহের প্রশমন, ক্ষেমঙ্করের একক সাধনায় মালিনীকে ধ্বংস করবার বাসনা, এবং পরিণতিতে ক্ষেমঙ্করের ব্যর্থতা—ইহাই নাটকের ঘটনাংশ। নাট্যকার ঘটনার সঙ্গে ভাব সত্যকে নিপুণ হাতে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। কোথাও কোনরূপ শাখাকাহিনীকে প্রশ্রয় দেন নাই। কোন শাখাকাহিনী না থাকায় মালিনী নাটকের কাহিনী সরলরেখায় পরিণতিমুখী হয়েছে। একাগ্র সরলতা, জটিলতাহীন পূর্ণতা এবং শাখাপ্রাখাহীন সংক্ষিপ্ততা এ নাটকের প্রধান বিশেষত্ব। নিঃসন্দেহ এ জিনিসটি গ্রীক নাটকের ঘটনাগত ঐক্যবোধেরই ইঙ্গিতবহ।

কিন্তু একথা বলা যায় না যে, এ নাটকের ঘটনাগ্রন্থনে শিথিলতা নাই। প্রথস দৃশ্যের শেষে রাজার মুখে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহচেষ্টা সংবাদ পাইয়া মালিনী ও রাজমহিষীর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় দৃশ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের উত্তেজনার চিত্র অঙ্কিত :হইয়াছে। এ চিত্রটি পূর্বপ্রসঙ্গেরই পুনরাবৃত্তি। এ অংশটি অপ্রয়োজনীয়। আবার,

তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে মালিনীর ভাবনায় রাজা ও রাজমহিষীর যে ব্যাকুলতা দেখানো হইয়াছে, তাহাও অপ্রয়োজনীয়। কারণ, দ্বিতীয় দৃশ্যে ঐ বিষয়ের একটা সমাধান আমাদের চোখে পড়িয়াছে।

তবে মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে, কিছুটা শিথিলতা বা পুনরুক্তি থাকিলেও মালিনীতে কাহিনীগত ঐক্য আছে। ইহার দ্রুত ঘটনাস্রোতের ধারায় কোন অবান্তর বাহিনী প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। এরূপ সংহতিকে গ্রীক নাটকসুলভ সংহতি বলিয়াই গণ্য করিতে হয়।

গ্রীক নাটকের সংলাপ আবৃত্তিমূলক। নাটকীয় সংলাপের মধ্যে যে ধরনের তীক্ষ্ণতা, সংক্ষিপ্ততা থাকে, গ্রীক নাটকে তাহার অভাব পাই। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক হাডসন বলিয়াছেন—

The language employed was of the rhetorical, not of the conversational kind—of the kind adopted to recitative or declamation.

মালিনী নাটকের যে কোন প্রধান চরিত্রের উক্তির দিকে লক্ষ্য করিলে গ্রীক নাটকের সঙ্গে এই সাদৃশ্যও চোখে পড়িবে। মালিনীর সংলাপ আবৃত্তিরসপ্রধান। গ্রীক নাটকের অনুরূপ recitative—declamatory.

ধর্মকে ভিত্তি করিয়া মালিনী নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে। মালিনীর উপজীব্য দুই ধর্মের সংঘাত। একদিকে চিরন্তন শাশ্বত মানবধর্ম, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম—আচার-অনুষ্ঠানে কণ্টকাকীর্ণ ধর্ম। ঐ দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ আঁকাই কবির লক্ষ্য। এখানেও গ্রীক নাটকের সঙ্গে মালিনী নাটকের সাদৃশ্য। সেক্সপীয়রীয় নাটকে মানবপ্রবৃত্তির চিরন্তন দ্বন্দ্বের যে পরিচয় আছে, মালিনীতে তাহা নাই।

একটু তলাইয়া দেখিলেই ধরা যায় যে—শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির "বহু-শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত" 'মালিনী'র মধ্যে নাই। সেরূপ নাটক-রচনা রবীন্দ্র-প্রতিভার ঠিক অনুকূলও ছিল না। 'মালিনী'তে বহু-দৃশ্যও নাই, উহা পঞ্চাঙ্ক নাটকও নহে। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের মতো উহাতে উপ-কাহিনীও অনুপস্থিত। তবে নাটকের ঘটনা-উপস্থাপনার মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রথম দৃশ্যেই বিরোধের বীজ বপন করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে উহাকে তীব্রতর করিয়া একটা নাটকীয় চমকের ভিতর দিয়া সংঘর্ষের আপাত অবসান ঘটানো হইয়াছে। আবার শেষ দৃশ্যে পূর্বে যে-সম্ভাবনার বীজ তখনও বিদ্যমান ছিল, উহারই ফলস্বরূপ নাটক বিষাদান্তক পরিণতিতে শেষ হইয়াছে।

অন্তরঙ্গে 'মালিনী'র সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুপ্রিয়ের চরিত্রগত দুর্বলতাই যে এই নাটকের বিষাদময় পরিণামের হেতু—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুপ্রিয়-চরিত্রের প্রধান দৌর্বল্য তাহার সহজাত দোদুল্যমানতা। সে নিজেই মালিনীকে বলিয়াছে, "বাল্যকাল হতে····· সংশয়ের স্রোতে আমি ভাসমান।" বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের সে প্রথমে বলিয়াছে—

> ব্রাহ্মণমণ্ডলী! আমি নহি একজন
> তোমাদের ছায়া। প্রতিধ্বনি নহি আমি
> শাস্ত্রবচনের।

কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী দৃঢ়চিত্ত ক্ষেমংকরের কাছে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আবার মালিনীর সান্নিধ্যে আসিয়া সে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতাও করিয়াছে। অবশ্য ইহার মূলে রহিয়াছে মালিনীর

প্রতি অনুরাগ ; কিন্তু দুর্বলচরিত্র না হইলে সে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিত না এবং তাহাকে পরিণামে বন্ধুহস্তে মৃত্যুও বরণ করিতে হইত না।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে চরিত্রগুলি অত্যন্ত সজীব ও প্রাণবান্। মালিনীতেও তাই। এ নাটকের চরিত্রগুলি গ্রীক নাটকের চরিত্রের মত স্বাধীনতাবিহীন, চাঞ্চল্য ও গতিক্ষমতাহীন হয় নাই।

মালিনী নাটকে গ্রীক-ট্র্যাজেডির নিয়তি-ভাবনা নাই। গ্রীক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিপর্যয়ের মূলে বর্তমান থাকে একটি দুর্বার দৈবশক্তি বা নিয়তি। গ্রীক নাটকে পাই—কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কর্মের দ্বারা সমাজস্থিতিকে বিচলিত করেন, তবে দেবতার রোষ তাঁহার উপর নামিয়া আসে। মালিনীর ট্র্যাজেডিতে সেরূপ কোন আভাস নাই। মালিনী নাটকের ট্র্যাজেডি মালিনীর তথা সুপ্রিয়েরও। সুপ্রিয়ের ট্র্যাজেডি তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বজাত আত্ম-অবক্ষয়ে। এটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির লক্ষণ। মালিনীর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্যও নিয়তি দায়ী নয়। তাহার নিজের জীবনের পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। করুণা ও প্রীতির অমূর্ত তত্ত্বকে অনুসরণ করিতে গিয়া মালিনী তাহার ব্যক্তিগত প্রেমের জীবনকে করিয়াছিল অস্বীকার। ব্যক্তিগত প্রেম মানবস্বভাবের অপরিহার্য অঙ্গ। মালিনী এই মানবস্বভাবকে অস্বীকার করিতে গিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে। তাহারই ফল হইয়াছিল ট্র্যাজেডি। শেক্‌স্‌পীয়র যেভাবে দৈবীলীলাকে দূরে রাখিয়া মানবচরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও একান্ত ব্যক্তিগত প্রবণতার মধ্যে মানুষের সর্বনাশ ও ধ্বংসের বীজ দেখিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথও তাঁহার মালিনী নাটকের ট্র্যাজেডি সৃষ্টির ব্যাপারে ঠিক সেই ভঙ্গিটিকে আশ্রয় করিয়াছেন। সেক্সপীয়র তাঁহার ট্র্যাজেডী নাটক-

গুলিতে ট্র্যাজিক বেদনার দাবদাহকে প্রশান্তি ও কল্যাণমন্ত্রে নির্বাপিত করিয়াছেন। তাঁহার নাটকে মৃত্যুর ও দুঃখের অমৃত-পরিণাম পরিলক্ষিত হইয়াছে। মালিনীতেও তাহাই আছে। মালিনী আত্মার দ্যুতিতে ট্র্যাজেডির যন্ত্রণাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়াছে। তাহার কল্যাণী চিত্তবৃত্তি সুপ্রিয়ের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়াছে—সমস্ত বিক্ষোভ-চাঞ্চল্যের উপর প্রশান্তির ধারা বহাইয়া দিয়াছে।

মালিনী নাটক গ্রীক ও সেক্সপীয়রীয় নাটকের মিলিত রূপ। গ্রীক নাটকের লক্ষণ এবং শেক্স্পীয়রের নাটক-লক্ষণ—দুই-ই এ নাটকে আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। মালিনী ট্র্যাজেডি বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচারে ইহা খাটি গ্রীক বা শেক্স্পীয়রীয় ট্র্যাজেডি নহে। নাটকখানিতে ঐ উভয় প্রকার ট্র্যাজেডির লুকোচুরি খেলা কিছুটা আছে, কিন্তু মূলত নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রীতিতেই রচিত।

'বিসর্জন' নাটকের রচনাকাল ১২৯৭ সাল, 'মালিনী'র রচনা-কাল ১৩০৩ সাল। উভয় রচনার মধ্যে কালগত ব্যবধান ছয়-সাত বৎসরের হইলেও উহাদের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বৈসাদৃশ্যও যে নাই তাহা নয়, কিন্তু সাদৃশ্যের ভাগটাই বেশি। এক্ষণে আমরা উহারই আলোচনা করিব।

'বিসর্জন' 'বহুশাখায়িত ও বহুব্যাপ্ত, উহার ঘটনাস্রোত বিচিত্র ও বহুক্ষণস্থায়ী, কিন্তু 'মালিনী'তে সেই ব্যাপ্তি নাই, উহার 'নাট্যরূপ সংযত ও দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।' কিন্তু অন্তরঙ্গে, অর্থাৎ চরিত্রসৃষ্টিতে ও নাটকের ভাববস্তুতে উভয় নাটকের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

দুই নাটকেরই ভিত্তি লৌকিক আচারসর্বস্ব ধর্ম ও নিত্যধর্মের মধ্যে সংঘাত। 'বিসর্জনে' চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে নিত্যসত্য মানবধর্ম বা হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে; দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে মিথ্যা ধর্মবোধের সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের—মানুষের রচিত আচার-বিধির সঙ্গে হৃদয়ের পরম সত্য প্রেমের, হিংসার সঙ্গে অহিংসার। 'মালিনী'তেও সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে করুণা ও মৈত্রীমূলক নবধর্মের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত 'বিসর্জনে'র পরিণতির মতোই মানবধর্মকে জয়ী করা হইয়াছে। দুই পক্ষের সাজসজ্জা ও যুক্তি-কৌশলও দুইটি নাটকেই একরকম, শুধু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গিমা ভিন্ন। এই সঙ্গে স্মরণীয় যে, উভয় নাটকেই স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর অংশ আছে। 'বিসর্জন' যে-উপন্যাসের পরিবর্তিত নাট্যরূপ, সেই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে আছে—মন্দির-সোপানে রক্ত-চিহ্ন দর্শনে ব্যাকুলা বালিকা-সম্পর্কিত স্বপ্ন, আর 'মালিনী' নাটকে আছে বিদ্রোহের চক্রান্ত উপলক্ষে দুই বন্ধুর একজনের অপর বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধু-হস্তে বিশ্বাসহন্তা বন্ধুর মৃত্যু-সম্পর্কিত স্বপ্ন।

কিন্তু সবচেয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—দুই নাটকের চরিত্র-চিত্রণে। 'বিসর্জনে'র রঘুপতি আর 'মালিনী'র ক্ষেমংকর, 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ আর 'মালিনী'র সুপ্রিয়, এমন কি 'বিসর্জনে'র অপর্ণা এবং কতকাংশে 'মালিনী'র মালিনী যেন একই চরিত্রের পুনরাবর্তন; মনে হয়, আগেরটির ছায়ায় যেন পরেরটি দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য একটির সঙ্গে আরেকটির প্রভেদও কিছু পরিমাণে আছে।

রঘুপতি ও ক্ষেমংকর দুইজনের চরিত্রকাঠিন্য তুলনীয়। ঋতুর সঙ্গে তুলনা দিতে গেলে বলিতে হয়, দুইজনেই যেন গ্রীষ্মঋতু—দুইজনেই রুদ্রতপস্বী। দুইজনেই সংকীর্ণ ধর্মমতের পরিপোষক।

উভয়েই জ্ঞানমার্গের সাধক, আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও অর্থহীন ক্রিয়া-কাণ্ডে বিশ্বাসী—অন্ধবিশ্বাসে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দুইজনের মধ্যেই প্রাচীনের স্বীকৃতি—প্রাচীনের সম্পদে শক্তি-সঞ্চয়ের বাসনা। দুইজনেই স্বধর্ম রক্ষার জন্য রাজদ্রোহী। দুইজনেই নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্য-সংগ্রহ করিতে বিদেশে গিয়াছে (অবশ্য 'বিসর্জনে'র রঘুপতি নয়, 'রাজর্ষি'র রঘুপতি) এবং তাহাদের চরিত্রাবেগের স্রোতে বিতাড়িত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বলপ্রকৃতি বিশ্বাসপ্রবণ সুপ্রিয় ও জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রঘুপতির মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তার ছাপ আছে, আচারধর্মের প্রতি এমন একটা অবিচল নিষ্ঠার ভাব আছে, নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের এমন একটা যুক্তিজাল অবতারণার ক্ষমতা আছে, যাহার নিকট জয়সিংহের সন্দেহ-দোলায়িত চিত্ত নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ক্ষেমংকরের মধ্যেও একই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। তাহার যুক্তিজালের কাছেও সুপ্রিয়কে নিতান্তই অসহায়ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। "কি রঘুপতি, কি ক্ষেমংকর, ইহারা যুক্তিতে কখনও কাহারও কাছে হার মানে না, হার মানে শুধু সেইখানে যেখানে মনের মধ্যে কোথাও কোনও স্নেহের অথবা কোনও সূক্ষ্মতর অনুভূতির একটুখানি লীলা আত্মগোপন করিয়া আছে।"[১] জয়সিংহের জন্য রঘুপতির মনে ছিল একটি সুগোপন গভীর স্নেহ, সুপ্রিয়কেও ক্ষেমংকর 'বন্ধুমোহে বক্ষোমাঝে প্রবল অটল প্রেম-পাশে' ধরিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু এক বিষয়ে রঘুপতি ও ক্ষেমংকরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে, উহা তাহাদের মূল চরিত্রভিত্তি। প্রথার প্রতি রঘুপতির বিশ্বাসের ভিত্তি তেমন দৃঢ় ছিল না। নাটকের প্রথমে রঘুপতি

১। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, নাটকের শেষ পরাজয়ের মধ্যে তাঁহার সে গর্ব ধূলায় লুটাইয়াছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রঘুপতি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করেন নাই। নির্বাসন-দণ্ড লাভ করার পর তিনি বিচলিতচিত্তে বলিয়াছেন—'গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব', কিন্তু 'রাজদ্বারে নতজানু' হইয়া 'দুটো দিন ভিক্ষা' মাগিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত যে-ধর্মে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, সেই ধর্ম ত্যাগও করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষেমংকর-চরিত্রে কোনো খাদ নাই, উহা বজ্রদৃঢ় ইস্পাতে গঠিত। চরিত্রটির মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার অহঙ্কারের দীপ্তি অটুট অক্ষুণ্ণ থাকিয়াছে। রঘুপতির মতো সে কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও সে সম্পূর্ণ অবিচলিত। রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি তাহাকে ক্ষমা করা হয় তবে সে কী করিবে, তখন দীপ্তকণ্ঠে সে বলিয়াছিল, 'পুনর্বার তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার, যে-পথে চলিতেছিনু আবার সে-পথে যেতে হবে।' যে পথকে সে সত্য বলিয়া জানিয়াছিল, তাহাকে পরিত্যাগ করার কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। শুধু তাহাই নয়, বন্ধু সুপ্রিয় অন্য পথে চলিবে, ইহাও তাহার সহনায় নয়, তাই বন্ধুর সঙ্গেই সে মৃত্যুকামনা করে। জয়সিংহ নিজে আত্মবলি দিয়াছিল, কিন্তু সুপ্রিয়ের মৃত্যু ঘটাইল ক্ষেমংকর নিজে এবং বন্ধুর মৃত্যু ঘটাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল না; মৃতদেহের উপর পড়িয়া, নিজেই ঘাতককে আহ্বান করিল। এই আহ্বানের মধ্যেই তাহার চারিত্র-দীপ্তি ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইসব কারণে রঘুপতির চরিত্র অপেক্ষা ক্ষেমংকরের চরিত্র অধিকতর সজীব ও প্রত্যক্ষ।

রঘুপতি আর ক্ষেমংকরের চরিত্রের মধ্যে যতখানি সাদৃশ্য

দেখিতে পাওয়া যায়, জয়সিংহ আর সুপ্রিয়ের চরিত্রের মধ্যে ততখানি সাদৃশ্য নাই। তবে দুইজনেই দোলাচলচিত্ত। এই হিসাবে উভয়ের মধ্যে যা সাদৃশ্য। জয়সিংহকে সত্যধর্মের সন্ধান দিয়াছিল অপর্ণা, সুপ্রিয়কে মালিনী। কিন্তু জয়সিংহের মধ্যে দ্বন্দ্ব অধিকতর প্রবল, সারা জীবন সে দ্বন্দ্বের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত সংশয়ের মীমাংসা করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই হিসাবে চরিত্রটি সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চরিত্রের সমগোত্রীয়। আর এই কারণেই চরিত্রটি আমাদের নিকট কেবল অধিকতর জীবন্ত বলিয়া বোধ হয় না, মধুরতর বলিয়াও উপলব্ধ হয়। সুপ্রিয়ও সন্দেহের দোলায় দুলিয়াছে, মালিনী এবং ক্ষেমংকর উভয়ের প্রভাবের দোটানায় পড়িয়া একবার নবধর্মের প্রতি, একবার ক্ষেমংকরের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছে। কিন্তু ক্ষেমংকরের বিদেশযাত্রার পর সেই সন্দেহ আর থাকে নাই। মালিনীর নবধর্মের কাছে – তথা মালিনীর প্রেমের কাছে সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অবশ্য বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে মর্মজ্বালা অনুভব করিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে নবধর্ম ও মালিনীর প্রতি অসংশয় বিশ্বাস লইয়াই ক্ষেমংকরের হাতে আপনার প্রাণটি তুলিয়া দিয়াছে। তাহার মৃত্যু ছিল শান্তি ও তৃপ্তির মৃত্যু।

'বিসর্জন' ও 'মালিনী' দুই নাটকেই তরুণী নারীচিত্তকে ঘিরিয়া একটি ভাবের বিকাশ ঘটিয়াছে—'বিসর্জনে' অপর্ণা আর 'মালিনী'তে মালিনী। দুটি নাটকেই নারী মোহমুক্তির সহায়িকা। উহারা unreality হইতে মুক্তির পথনির্দেশ করিয়াছে—মানুষের জড়ত্ব ঘুচাইবার সাধনা তাহাদের। তবে অপর্ণার ভাবমূর্তিটি একটু বেশিমাত্রায় প্রত্যক্ষ, মালিনীতে ততটা নহে। অপর্ণা

অনেকটা রহস্যময়ী, নাটকের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাহার তেমন যোগ নাই, তথাপি নাটককে সে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই চরিত্রের মানবীয় দিকটা অনেকখানি অপ্রত্যক্ষ, তাই অপর্ণাকে ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মালিনী-চরিত্র সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ, তাহার দেবীসত্তা ও মানবী-সত্তা দুই-ই নাটকে বিরুদ্ধ শক্তির উপর ক্রিয়াশীল। দেবীসত্তায় সে বিদ্রোহী প্রজাগণকে জয় করিয়াছে, মানবী-সত্তায় সুপ্রিয়কে। অপর্ণার মতো সে ছায়ামূর্তি নয়, সে জীবন্ত করুণা ও প্রেমের প্রতিমা।

দুটি নাটকই ট্র্যাজেডী, কিন্তু মালিনীর ট্র্যাজেডী এমনই ঘনীভূত এবং এত প্রবল ও স্বল্পকালস্থায়ী যে, সে তুলনায় 'বিসর্জনে'র ট্র্যাজেডি অতিশয় তরল ও নিষ্প্রভ। 'মালিনী'র শেষ পরিণাম গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুরূপ।

'বিসর্জন' গীতিধর্মী নাটক, 'মালিনী'তে লিরিকধর্ম কম। 'বিসর্জনে' আত্মবিশ্লেষণ বিশদ, মালিনী'তে স্বল্পভাষণ ও সংযম—আখ্যানবস্তুর সংহতি। 'বিসর্জনে'র ভূমিকাগুলি মানবহৃদয়ের কোন না কোন চিরন্তন আবেগকে প্রকাশ করিয়াছে, মুহূর্তের অনুভূতি নাটকীয় ভঙ্গীতে সেখানে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে লিরিকের স্বাদ গন্ধ ও বর্ণ। জয়সিংহ, রঘুপতি, অপর্ণা চিরন্তন হৃদয়াবেগের প্রতীক। ইহাদের অধিকাংশ উক্তি গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। 'মালিনীর' ভূমিকাগুলি কতকাংশে হৃদয়াবেগের প্রতীক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের আচরণ কথাবার্তা নাটকীয়। 'মালিনী'তে প্রত্যেকটি দৃশ্যের উদ্‌ঘাটন আকস্মিক, ঘটনার স্রোত দ্রুত চলমান। চরিত্রগুলি কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে নাই। অবান্তর কাহিনীর গ্রন্থন 'মালিনী'তে নাই।

বিসর্জন নাটকের শেষে জয়সিংহের প্রাণবিসর্জন, মালিনীতে

সুপ্রিয়ের মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যু ব্যর্থ হয় নাই। মৃত্যু ভেদ করিয়া অমৃত ঝরিয়াছে—সত্যের আলোকরশ্মি প্রকাশ পাইয়াছে। মৃত্যুতে মুক্তির ঝঙ্কার শুনা গিয়াছে। মৃত্যু দিয়া আনন্দের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জীবনের চরম মূল্য দিয়া সকল মানুষের জন্য পথমোচন হইয়াছে—জড়ত্বনাশ হইয়াছে। বিসর্জনের রঘুপতি জয়সিংহকে হারাইয়া সত্যকে পাইয়াছেন। মালিনীতে সুপ্রিয়ের মৃত্যু মালিনীর নারীধর্মকে বিকশিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে দুঃখ বিদীর্ণ হইয়া আনন্দ বিকীর্ণ হইয়াছে—মৃত্যুর মধ্য দিয়া পাওয়া গিয়াছে নূতন আরম্ভের ইঙ্গিত। তাঁহার নাটকের মৃত্যু মহাজীবনের সূচনা, নবজীবনের ভিত্তি। "মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে"—এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের ভিত্তি। উহা যেন যতির কল্যাণে ছন্দসৃষ্টি।

'মালিনী' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র মালিনী। রবীন্দ্রনাথ নিত্যধর্মের প্রতিমূর্তিরূপে চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিত্যধর্ম করুণা ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মালিনী করুণার ভাবমূর্তি। অন্তত নাটকের প্রথম অংশে ইহাই সত্য। যদিচ 'মালিনী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার অন্তরস্থিত ধর্মপ্রেরণা কোনো দৈববাণীকে আশ্রয় করে নাই, তথাপি নাটকের প্রথমভাগে মালিনীর মধ্যে দৈব-প্রেরণারই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মালিনীর সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয়, তখন দেখিতে পাই—তাহার জীবনে এক নবধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই আবির্ভাব তাহার নিকট বিস্ময়ের বস্তু, উহাকে সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। তাই সে বলে—

ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—আমি কিছু নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা যেন ডাকিছে আমারে!

একটা বৃহত্তর আদর্শের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, এই প্রেরণা তাহার মনে জাগিয়াছে—

সবলোকে
যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির সংসার।

এই প্রেরণাবশেই সে বিদ্রোহী প্রজাগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ঐ দৈব আবির্ভাবের ফলে যে-শক্তি সে সাময়িকভাবে লাভ করিয়াছে, উহারই বলে বিদ্রোহী প্রজাদের মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো মুগ্ধ করিতে পারে। অবশ্য গুরু কাশ্যপের নিকট সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, উহার ফলে করুণা মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের কথা তাহার অজানা ছিল না। ইহার সহিত দৈবী-প্রেরণা যুক্ত হওয়ায় জগতের দুঃখ-বেদনা দূর করার জন্য সে তাহার নিজের মধ্যে একটা দুর্বার প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই কারণেই বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের সে বলিয়াছে—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে।

কিন্তু মালিনীর এই প্রেরণা দৃঢ়ভাবে তাহার প্রকৃতির মূলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহা একটা ক্ষণস্থায়ী Revelation-এর মতো।

তাই গৃহে ফিরিয়াই সেই ক্ষণিকের উন্মাদনার অবসাদে সে নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পর হইতে মালিনীর যে-রূপ আমরা নাটকে দেখি, তাহাতে নবধর্মের চিহ্ন নাই, আছে নিতান্তই মানবিক প্রেমধর্মের চিহ্ন। জনৈক সমালোচক ইহার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইহার (এই দৈবী-প্রেরণার) মূলে দীর্ঘকাল-ব্যাপী ধর্ম-জীবনের সাধনা ছিল না। সেইজন্য যতদিন দিব্য-প্রেরণার দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল, ততদিন মালিনী যেন পথ দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু সাধনাহীন দিব্যপ্রেরণা মিলাইতেই তাহার চোখে সব অন্ধকার হইয়া গেল, মালিনী সাধারণ রাজকন্যায় পর্যবসিত হইল। অপ্রত্যাশিত দিব্যপ্রেরণার তলাতে সাধনা না থাকিলে সে দীপ্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যদি এই অপ্রত্যাশিত প্রেরণাকে সে সাধনায় নিয়োগ করিয়া ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এমন ঘটিত না। কিন্তু সদ্যোজাত অভিজ্ঞতাকে সে জীবনে লালন করিয়া না তুলিয়াই সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, অভ্যাসের মধ্যে তাহার শিকড় গজাইবার অবসর দেয় নাই; সেইজন্য ব্যক্তিগত প্রেমের প্রবল অভিজ্ঞতা যখন তাহার কুমারীচিত্ত স্পর্শ করিল, তখন তাহা দিব্যপ্রেরণার চেয়ে প্রবলতর হইয়া দেখা দিল; হঠাৎ দেবীর চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া প্রণয়াতুর সুপ্ত মানবকন্যা বাহির হইয়া আসিল।" মালিনীর মধ্যে দিব্যপ্রেরণার চেয়ে প্রবলতর ছিল তাহার নারীধর্ম। তাই এ নাটকে অকস্মাৎ দেবীর চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া প্রণয়াতুর সুপ্ত মানবকন্যা বাহির হইয়া আসিয়াছে। যদিও নাটকের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে একটা আইডিয়ার রূপমূর্তিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তথাপি মনে হয়—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রূপায়িত করিবার জন্যই মালিনীর মধ্যে তিনি ঐরূপ একটা পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।

নাটকের শেষ অংশে আমরা মালিনীকে মানবীরূপেই দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, সে সুপ্রিয়ের প্রতি আকৃষ্টা হইয়া তাহাকে বলিতেছে—

হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা।

আজ প্রণয়িনীরূপে সে বুঝিযাছে—"দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিকের তরে আসে।" সুতরাং তাহার পক্ষে বিশ্বাসের অন্য পাত্র চাই, সে পাত্র সুপ্রিয়। তাই সে 'বন্ধু' 'মন্ত্রগুরু' হইবার জন্য সুপ্রিয়ের কাছে আকুল আবেদন জানায়। এই কারণেই তাহার দর্শনাভিলাষী প্রজাগণকে সে তাহার পূর্বেকার দেবীর ভূমিকা অভিনয়ের অক্ষমতা জানাইয়া বলিয়াছে—

আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার, আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি…।

সাধারণ প্রণয়িনীর মতো সে এখন তাহার প্রণয়ীর সুখদুঃখের কথা, 'গৃহের বারতা সব আত্মীয়ের মতো' শুনিতে চায়। তারপর রাজা যখন পুরস্কারস্বরূপ মালিনীকেই সুপ্রিয়ের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিলেন এবং সুপ্রিয় বন্ধুদ্রোহের বিশ্বাসভঙ্গজনিত অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল, তখন আশাহতা মালিনীর সেই দীর্ঘশ্বাস—

ওরে রমণীর মন
কোথা হতে বক্ষ মাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়াবিরহিতা
কপোতীর প্রায়।

ইহা হইতে আর বুঝিতে বাকি থাকে না, মালিনী নিতান্তই মানবী। বিবাহের প্রস্তাবে তখন তাহার 'ভাল লজ্জার আভায় রাঙা' হইয়া

উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কী? রাজা সত্যই বুঝিয়াছিলেন, মালিনী 'দেবী না রে, দয়া না রে, ঘরের সে মেয়ে।' এইভাবেই ঘরের মেয়ের মধ্যে দেবী মালিনীর অবলুপ্তি ঘটিয়াছে।

কোনো কোনো সমালোচক সাধারণ মানবী মালিনীকে সাধারণতর করিয়া এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, মালিনী ক্ষেমংকরের প্রতিই আসক্তা হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা বিশেষ করিয়া দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। শৃঙ্খলিত ক্ষেমংকরকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিয়াছিল—

লোহার শৃঙ্খল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল
ওই অঙ্গ 'পরে! মহত্ত্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরাণ
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

দ্বিতীয় উক্তিটি নাটকেরও শেষ উক্তি—সুপ্রিয়ের হত্যাপরাধী ক্ষেমংকরের জন্য মালিনী রাজার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল এই বলিয়া—'মহারাজ, ক্ষম ক্ষেম করে।'

কিন্তু সে ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগিণী নহে। ক্ষেমংকরকে প্রথম দেখিয়া সে যাহা বলিয়াছে—উহা কেবল মহত্ত্বের প্রতিই একটা শ্রদ্ধা-প্রদর্শন মাত্র। সুপ্রিয়ের নিকট ক্ষেমংকরের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, পূর্বোক্ত উক্তিটি উহারই প্রকাশমাত্র—তাহার বেশি আর কিছু নয়। নহিলে, রাজা যখন সুপ্রিয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন, তখন মালিনী একথা বলিত না—

হৃদয় কাঁপিছে বুকে!
কী যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে

বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা কর পিতঃ,
আনিয়ো না সুপ্রিয়েরে।

মালিনীর শেষ উক্তিটি সম্পর্কে বহু সমালোচকই বলিয়াছেন যে, উহা মালিনীর 'অহিংস ধর্মের প্রেরণা ও নারীসুলভ কারুণ্য মাত্র। ক্ষেমংকর তাহার মনে কোনো ভাবদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নাই। সে সুপ্রিয়কেই ভালোবাসিত এবং সুপ্রিয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সে ক্ষেমংকরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছে।'

মোট কথা, নাটকের শেষ অঙ্কে—অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে, মালিনী দৈবীপ্রেরণাসম্পন্না নারী নয়, সে সাধারণ মানবী মাত্র। সেই দৃশ্যে নবধর্মের কোনো প্রকাশও তাহার মধ্যে দেখা যায় না। সুতরাং আকস্মিকভাবে তাহার উপর 'অহিংস ধর্মের প্রেরণা' চাপাইতে গেলে চরিত্রটির প্রতি সম্ভবত খুব সুবিচার করা হয় না। মানবীকে নূতন মাধুর্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে শেষ দৃশ্যে মালিনীর মুখে শেষ কথাটি দেওয়া হইয়াছে।

সুপ্রিয় 'মালিনী' নাটকের নায়ক। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়াছে। নাটকের প্রথমার্ধে মালিনীই কেন্দ্র-চরিত্র ছিল, কিন্তু উত্তরার্ধে সে আর উহা থাকে নাই। মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়ের প্রেমের বিকাশ দেখাইবার জন্যও প্রথমার্ধের প্রয়োজন ছিল। তারপর মালিনীকে হারাইবার ভয়ে বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা সে করিয়া বসিল। এইরূপে নাটকীয় সংঘাত চরমে উঠিল এবং তাহার মৃত্যুর ভিতর দিয়া নাটক পরিণতি লাভ করিল।

সুপ্রিয় দোলাচলচিত্ত, হৃদয়াবেগের একান্ত অধীন, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সেই হৃদয়াবেগেরই একটা প্রকাশ। হৃদয়াবেগপ্রবণ বলিয়াই হৃদয়গত ধর্মের প্রতি তাহার আগ্রহ,

ধর্মমত অপেক্ষা মানুষের প্রতি বেশি টান। সংসারকে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধনে বাঁধিবার একটা প্রেরণা তাহার মধ্যে বলবতী। তাহার মধ্যে প্রাণময় প্রেমধর্ম পুরামাত্রায় বিদ্যমান এবং মালিনীর মধ্যে সেই প্রাণময় প্রেমধর্মের স্ফুরণ দেখিয়া সে স্বভাবতই তাহার প্রতি আকৃষ্ট। সে ক্ষেমংকরের পরম সুহৃৎ। তাহার বন্ধুপ্রীতিও অপরিসীম—অন্তত নাটকের প্রথমার্ধে। কিন্তু দুর্বলচিত্ত হওয়ার জন্যই সে কখনও মালিনীর প্রাণময় প্রেমধর্মের প্রতি, কখনও ক্ষেমংকরের আচারধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তাহার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের অভিঘাত সৃষ্টি হইয়াছে।

নাটকের প্রথমেই দেখা যায়, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিতা মালিনীর নির্বাসন চাহিয়াছে, তখন ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহার মতদ্বৈধ হইয়াছে। প্রেম এবং দয়াধর্ম, মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শ তাহার কাছে অর্থহীন যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম, ব্রত উপবাস অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হইয়াছে। তাই সে অকপটে বলিয়াছে—

> যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস
> এই শুধু ধর্ম বলে করিব বিশ্বাস
> নিঃসংশয়ে ? বালিকারে দিয়া নির্বাসন
> এই ধর্ম রক্ষা হবে ? ভেবে দেখো মনে
> মিথ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার,—
> সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
> সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার।

কিন্তু এই সুপ্রিয়ই তাহার বন্ধু ক্ষেমংকরের কথায় তাহার মত পরিবর্তন করিয়াছে। প্রেমধর্মের প্রতি তাহার যে-আকর্ষণ জাগিয়াছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া আচারধর্মের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে—

তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে ধরি। যুক্তি-সূচি 'পরে
সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে।

আবার মালিনীকে দেখিয়াই তাহার অন্তরে ভাবান্তর ঘটিল, সে প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। ক্ষেমংকরকে বলিল—

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর—ভ্রমিলাম
বৃথা এ সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজি আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর হৃদয়ের বড় কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা,—
আমার অন্তর মাঝে কই কহে কথা,
কী প্রশ্নের দেয় সে উত্তর—কী ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা! ......এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

এইভাবে সুপ্রিয়ের মন দ্বন্দ্ব-সংশয়ের দোলায় ক্রমাগতই আন্দোলিত হইয়াছে। কখনও সে ভাবাবেগে মালিনীর পাশে দাঁড়াইয়াছে, কখনও ক্ষেমংকরের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

চরিত্রটি একান্তভাবেই হৃদয়াবেগের অধীন। তাই তাহার মধ্যে স্থিরচিত্ততার অভাব। আবেগের মুহূর্তে যাহা তাহার কাছে সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই সে আশ্রয় করে। ক্ষেমংকরের সুহৃৎ হইলেও ক্ষেমংকরের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তাহার মধ্যে নাই। ইহাকে

তাহার চরিত্রগত দৌর্বল্য বলা যাইতে পারে। আবার এমনও বলা যাইতে পারে—হৃদয়াবেগের দ্বারা সে নিজেকে পরিচালিত করিয়াছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। তাহার ধর্ম হৃদয়ধর্ম, তাহার মন কবির মন।

ক্ষেমংকরের দেশত্যাগের পর সুপ্রিয় মালিনীর নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছিল এবং তখন হইতেই সে খুব বেশি করিয়া মালিনীর প্রেমধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ক্ষেমংকরের দেশত্যাগের পর সুপ্রিয় পরিপূর্ণভাবে প্রেমধর্মের কাছে—মালিনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে। ক্ষেমংকর যতদিন তাহার সম্মুখে ছিল, ততদিন সংশয়ের দোলায় সে দুলিয়াছে। কিন্তু ক্ষেমংকর চলিয়া যাওয়ায় তাহার এই সংশয় কাটিয়া গিয়াছে। বন্ধুপ্রীতি ও মালিনীর প্রতি প্রেম—এই উভয়েব দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত নাটকে সুপ্রিয়ের ক্ষেত্রে প্রেমেরই জয় হইয়াছে।

> হে দেবী, তোমারি জয়। নিজ পদ্মকরে
> যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
> জ্বালায়েছ—আজি হল পরীক্ষা তাহারে—
> তুমি হলে জয়ী।...ভক্তের পরীক্ষা হল আজ,
> জয় দেবী।

'দেবী, তব জয়' বলিয়া প্রেমের জয় সরবে ঘোষণা করিয়া সে মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়ের প্রেম—আদর্শায়িত প্রেম, কিছুটা idlalistic বা platonic। সুপ্রিয়ের প্রেম আমাদের প্রতিদিনের মানবজীবনের ভালোবাসা এবং বৃহত্তর ভাবময় জীবনের ভালোবাসার একটা সংমিশ্রণ। তাহার প্রেম মিলনে সার্থকতা খোঁজে নাই, বিরহে নবীন থাকিতে চাহিয়াছে। তাহাকে আকৃষ্ট

করিয়াছে—মালিনীর শুধু রূপলাবণ্য নয়, মালিনীর মৈত্রী-প্রীতির আদর্শ। এইজন্য ভোগের রাজ্যে সে হাত বাড়ায় নাই। দূর হইতে সম্ভ্রমমিশ্রিত দৃষ্টিতে মালিনীর প্রতি চাহিয়া সে তাহার সৌন্দর্যপূজার হোমশিখাকে প্রদীপ্ত রাখিয়াছে।

বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সুপ্রিয়-চরিত্রের একমাত্র কলঙ্ক। ইহা অধর্মও বটে। কোনো যুক্তি দ্বারাই ইহার সমর্থন করা চলে না। কিন্তু এই খুঁতটুকু আছে বলিযাই সুপ্রিয়-চরিত্র আমাদের কাছে অনেক বাস্তব, অনেক সত্য বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকে আচারধর্ম ও হৃদয়ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন। ক্ষেমংকর-চরিত্রটি আচারধর্মের প্রতীক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য ক্ষেমংকর তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। চরিত্রটি মালিনীর বিরুদ্ধশক্তি হিসাবে পরিকল্পিত। মালিনী যে সত্যধর্মের অনুসরণ করিয়াছে, সেই আদর্শের সঙ্গে ক্ষেমংকরের প্রভাব—প্রতিপত্তির দ্বন্দ্ব নাটকে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একটা আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, একটা প্রবল আত্মাভিমান এবং একটি বজ্রকঠিন দৃঢ়তা ক্ষেমংকর চরিত্রের মূল সুর। সময় বিশেষে তাঁহার 'ইন্দ্রতুল্য মূর্তি'র মধ্যেও 'বজ্রসম ভয়ংকর পরমাশক্তি'র আভাস দেখা যায়, ভ্রূকুটিতে দেখা যায় আসন্ন ঝড়ের সংকেত। এই ভীষণ সৌন্দর্য তাহার বহিরঙ্গে নয়—মনেও। নিজ ধর্মমতের পরাজয়ের ভাবনা তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, সেই ধর্মমতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হয়, এমন কি আবাল্য বন্ধুকেও হত্যা করিতে সে দ্বিধাবোধ করে না। জীবন ও ধর্ম তাহার নিকট এক ও অখণ্ড।

মালিনীর নবধর্মের প্রবল বিরোধীরূপেই ক্ষেমংকরের সঙ্গে

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। নবধর্মের অভ্যুদয়ে পিতৃধর্মের সনাতন দুর্গ যখন বিপন্ন, তখন সে সেই দুর্গরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। ইহার জন্য সে রাজদ্রোহেও পশ্চাৎপদ নয়। কিন্তু সেই দ্রোহের মধ্যে কোন রূপ হীনতা বা নীচতা নাই। নিজ আদর্শের জন্য সে যে-কোনো দুঃখবরণে প্রস্তুত। তাহার চরিত্র দুঃখব্রতীর মহিমময় চরিত্র।

বিরুদ্ধপ্রকৃতির হইলেও সুপ্রিয় তাহার আজন্মবন্ধু। কিন্তু চরিত্রপ্রাবল্যে সুপ্রিয়ের উপর তাহার অপ্রতিহত প্রভাব। সুপ্রিয় নিজেই বন্ধুর বর্ণনা দিয়াছে এইভাবে—

সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ, বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ। বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটল চিত্ত, সংশয়ের স্রোতে।
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষোমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে।

ক্ষেমংকরের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না, ফাঁকি ছিল, না। অথচ দুই বন্ধুর চরিত্রে কী দুস্তর ব্যবধান! মালিনীকে দেখিয়াই সুপ্রিয় মুগ্ধ হয়, বলিয়া উঠে—

এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

মালিনীকে দেখিয়া ক্ষেমংকরেরও যে চোখে ঘোর লাগিয়াছিল চিত্তে সৌন্দর্যাবেশ জন্মিয়াছিল—নাটকের শেষ দৃশ্যে সুপ্রিয়ের কাছে তাহা সে স্বীকার করিয়াছে—

আমি কি দেখিনি ওরে ?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে'
কঠিন পুরুষ মন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
জন্মে নি কি স্বপ্নাবেশ ?

কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তায়, কর্তব্যের সুকঠোর আহ্বানে মনের সেই দৌর্বল্যকে সে জয় করিয়াছিল --

তবু কি সবলে
ছিঁড়িয়া মায়ার বন্ধ, যাইনি কি চলে,
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মতো
লইনি কি শিরে ধরি' অপমান শত
হীন হস্ত হতে---সহিনি কি অহরহ
আজন্মের বন্ধু তুমি তোমার বিরহ !

ক্ষেমংকরের এই সুকঠোর সংযম, ত্যাগ ও দুঃখ-স্বীকারের এই গভীরতা তাহার সংকীর্ণ ধর্মাদর্শ সত্ত্বেও তাহাকে আমাদের নিকট মহৎ করিয়া তুলিয়াছে।

সুপ্রিয়ের হৃদয়-দৌর্বল্য সম্বন্ধে ক্ষেমংকর সচেতন ছিল বলিয়াই সে তাহাকে মালিনী সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, 'মায়ার পশ্চাতে' যাইতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সতর্কবাণী কার্যকরী হয় নাই, সুপ্রিয় মালিনীতে আসক্ত হইয়াছিল, নবধর্মও গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, আবাল্যবন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছিল। কিন্তু আত্মাভিমানী ক্ষেমংকর উহা সহ্য করিতে পারে নাই। তাহার কাছে ধর্ম ও জীবন অভিন্ন। তাই মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষেমংকর বন্ধুকেও তাহার সহযাত্রী করিয়া লইল। ইহা বন্ধুপ্রণয়হেতু বন্ধুর প্রায়শ্চিত্তে সাহায্যস্বরূপ।

সুপ্রিয়কে হত্যার পূর্বে তাই সে বলিয়াছে যে, ‘বাল্যকালে তাহারা যেমন সারারাত্রি তর্ক করিয়া প্রভাতে গুরুর কাছে সত্যনির্ণয় করিবার আশায় যাইত—আজও তেমনি দুইজনে জীবনতর্কের মীমাংসার জন্য ধর্মরাজ মৃত্যুর কাছে যাইবে।’ কারণ—

সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত;—
মুহূর্তে পর্বতপ্রায় বিচার বিরোধ
বাষ্পসম কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে।

নাটকের আগাগোড়াই ক্ষেমংকর-চরিত্রটি দৃঢ়চিত্ত। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার আত্মাভিমানের দীপ্তি অটুট, অক্ষয়। চরিত্রটি নিষ্কম্প প্রোজ্জ্বল দীপশিখার মতো। রাজা যদি তাহার মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন, তবে সে কী করিবে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষেমংকর নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়াছে—

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার,—
যে-পথে চলিতেছিনু আবার সে-পথে
যেতে হবে।

নিজহস্তে বন্ধুর মৃত্যু ঘটাইয়াও ক্ষেমংকর বিহ্বল হইয়া পড়ে নাই, বন্ধুর মৃতদেহের উপর পড়িয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে—‘এইবার ডাক ঘাতকেরে।’ এই তাহার শেষ কথা এবং এই শেষ কথা তিনটিতে তাহার চরিত্রের আজন্মকালের দীপ্তি ও গর্ব ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

তপতী

তপতী পুরাতন নাটকের রূপ। 'রাজা ও রাণী' নাটকখানি আগাগোড়া পুনর্লিখিত হইয়া তপতী নাটকে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। নূতন নাটক তপতীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

রাজা ও রাণী আমার প্রথম বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা। রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি।

পুরাতন নাটকখানিতে যে অস্পষ্টতা ছিল, তাহাকে স্পষ্ট করিতে গিয়া কবি যখন তাঁহার এই নাটকখানি লিখিলেন, তখন দেখা গেল ইহা সম্পূর্ণ নূতন একখানি নাটক হইয়াছে।

তপতী নাটকের আরম্ভে দুই দেবতার পূজা লইয়া বিরোধ। ভোগের দেবতা মদন আর ত্যাগের দেবতা যোগীশ্বর শিবের দ্বন্দ্ব দিয়া তপতী নাটকের শুরু। জালন্ধররাজ বিক্রম কাশ্মীররাজ্য জয় করিয়া সেখানকার রাজকুমারীকে লইয়া আসিয়াছেন। বিজয়োৎসব হইবে—এজন্য তিনি চাহিয়াছেন মদনকে সেই উৎসবের কর্তৃত্ব দিতে। দেবদত্ত রাজার হিতৈষী, রাজ্যের হিতৈষী। তিনি চাহিয়াছেন রুদ্র-ভৈরবকে উৎসবের কর্তৃত্ব দিতে। দেবদত্ত রুদ্র-ভৈরবের স্তুতি করিয়াছেন, কারণ এই দেবতাটি শুধু স্বপ্ন, কেবল অলস সৌন্দর্য-উপভোগের মধ্যে মানুষকে বাঁধিয়া রাখেন

না ; ক্ষুদ্র খণ্ডিত জীবনের গণ্ডি ভাঙিয়া বৃহত্তর জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইবার এক প্রবল শক্তি মানুষের ভিতর জাগাইয়া দেন। এই দেবতা প্রলয়ের দেবতা, ইনি প্রলয়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেন, মোহের আবরণ ছিন্ন করার জন্য। জীর্ণতার আড়াল সরাইয়া ঘটে তাঁহার আবির্ভাব।

নাটকের আরম্ভদৃশ্য ভৈরবমন্দিরের প্রাঙ্গণ। সে প্রাঙ্গণে দেবদত্ত ও একদল উপাসক। তাহারা গান গাহিয়াছে—

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ-দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো।
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

এই গান ভোগের দেবতা মদনকে ভস্মীভূত করিয়া শিব বা মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে। এই গান কঠিন আঘাতে—

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,—

যাহা—

উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি'।

—বলাকা ৩৭॥

তাহার অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছে

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—

যাহা 'ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলেস্থলে বেড়ায় ফিরিয়া'—তাহাকে প্রতিহত করার মত শক্তি এই গানটির ভিতর দিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই গানটি রুদ্র ভৈরবের জাগরণ চাহিয়াছে। বলিয়াছে—যে পাপ দেশের মধ্যে আজ পুঞ্জীভূত, হে রুদ্র দেবতা! সেই পাপ আজ তুমি মার্জনা করো।

পৃথিবীতে মঙ্গলালোক যখন আচ্ছন্ন হইয়া যায়, অসহায় মানুষের কান্নার রোল যখন শূন্যপানে উঠিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে, যখন প্রতিকারহীন পরাভবের মধ্যে মানুষকে দিনযাপন করিতে হয়, অহেতুক নির্যাতন নিত্যনিয়ত মানুষকে সহিতে হয়, সেই সময়ে প্রতিটি মানুষের ক্রন্দনধ্বনি বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে এমনি করিয়াই গর্জিয়া উঠে। তপতী নাটকের প্রারম্ভে তাহারই ইঙ্গিত।

কবির এই নূতন নাটকের আরম্ভেই বিরোধের বীজ উপ্ত হইয়াছে। জালন্ধর রাজ বিক্রম কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া চাহিয়া বসিলেন কাশ্মীরের রাজকুমারীকে। অনুপম তাঁহার রূপ, অপরূপ তাঁহার জ্যোতির্মূর্তি। এই যে চাওয়া—ইহার মধ্যেই ছিল ট্র্যাজেডির বীজ। শুরুতেই দ্বন্দ্বের সূচনা।

বিক্রমদেবে অন্ধ আবেগ, রাণী সুমিত্রায় নিঃস্বার্থ ত্যাগ। বিক্রম কর্তব্যবিমুখ। রাজার কর্তব্যভার ছাড়িয়া প্রথম হইতেই তিনি

রাণীর রাজত্বে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্যমোহে তিনি কল্যাণবোধ-রহিত। কর্তব্য ও দায়িত্ববিরহিত প্রেম তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে—মোহে তিনি আচ্ছন্ন ও বিবশ। রাজ্যের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া তিনি একটা মোহমরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছেন। বিক্রমের প্রেম উদ্দামবেগে তাঁহাকে চারিদিকের সহস্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সে প্রেম তাঁহাকে সংসারের চিরকালের অভ্যস্ত পথ হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে। মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বিক্রম মনে করিয়াছেন যে, তিনি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। প্রেমের উত্তেজনায় স্বতন্ত্র হইয়া তিনি জীবন যাপন করিতে চাহিয়াছেন। আসক্তির উদ্দামতা হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। মোহের আবেশ তাঁহাকে এমনই বিহ্বল করিয়াছিল যে, সেজন্য আপন উক্তি ও আচরণের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। মুখে তিনি বলিয়াছেন—

> ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
> রুদ্র বহ্নি হ'তে লহো জলদর্চি তনু।
> যাহা মরণীয় যাক মরে,
> জাগো অবিস্মরণীয় মূর্তি ধরে।
> যাহা রুঢ়, যাহা মূঢ় তব,
> যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
> মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
> হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

যাহা স্থূল ও শ্রীহীন তাহা ধ্বংস হউক, প্রেম sublimated হউক, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক—ইহা তিনি কামনা করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

জালন্ধব-বাজ বিক্রম সুমিত্রাব বাহিবেব রূপলাবণ্যটুকুই দেখিযাছেন, তাহাব অন্তবেব ঐশ্বর্য ও লাবণ্যেব পবিচযটুকু পান নাই, পাইবাব চেষ্টাও কবেন নাই। সুমিত্রা বসন্ত কিন্তু বাজা বসন্তেব বাহিবেব রূপেই আত্মহাবা, তাহাব অন্তবে যে বৈবাগীটি ছিল তাহাব খোঁজ লন নাই। সুমিত্রাব ঐশ্বর্য বসন্ত ঋতুব ঐশ্বর্যেব মতই বাহিবে ও অন্তবে। বিক্রম তাঁহাব বাহিবটা দেখিযাই মুগ্ধ হইযাছেন তাহাব অন্তবেব গভীব প্রদেশে আপন দৃষ্টিকে পসাবিত কবিতে পাবেন নাই। বাহিবেব সৌন্দর্যেব চেযে গভীবতব কোন কোন সত্য যে থাকিতে পাবে, এ বিশ্বাসটুক বিক্রমেব ছিল না। এইজন্যই সুমিত্রাকে তিনি পাইযাও পান নাই।

সত্যকাব প্রেমদৃষ্টি যাহাব লাভ হইযাছে, তাহাব কাছে বাহিবেব ঐশ্বর্য ও ভিতবেব ত্যাগধর্ম এব বৈবাগ্য যুগপৎ ধবা পড়ে। এই অভিজ্ঞত —সত্যকাব এই প্রেমদৃষ্টি লাভ কবিতে হয অনেক দুঃখে। দুঃখেব মূল্যেই এই সত্যদৃষ্টি লাভ বিক্রমেব জীবনে ঘটিয়াছে।

বাজা বিক্রম কাশ্মীব গিযা যে যুদ্ধ কবিযাছিলেন, তাহাতে যশেব লোভ ছিল না। কাশ্মীবেব বাজকুমাবী সুমিত্রাব আশায তিনি যুদ্ধ কবিযাছিলেন। নিজেব শক্তিব প্রচণ্ডতায বিজিত বাজ্যেব বিস্ময জাগাইযা সুমিত্রাকে লাভ কবা ছিল তাহাব লক্ষ্য।

বিক্রমদেবেব আক্রমণে কাশ্মীব বাজ্য হইযাছিল বিপর্যস্ত কাশ্মীব পবিণত হইযাছিল এক ত্রাসেব বাজ্যে। সে আক্রমণে প্রজাদেব নিপীড়ন-নির্যাতনেব সীমা-পবিসীমা ছিল না। সেদিন উৎপীড়িতেব কান্নাব বোলে কাশ্মীব ভবিযা গিযাছিল। সেই কান্নায ব্যথিতচিত্ত হইযাছিলেন সুমিত্রা। ব্যথায বিহ্বলচিত্ত বাজকুমারী সেদিন আগুনে আত্মাহুতি দেওযার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সেদিন সুমিত্রার মনে হইয়াছিল, বিজয়ীর চরণে আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। তাই চিতার আগুনে আত্মাহুতি দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার সে সংকল্প সিদ্ধ হয় নাই। রাজ্যের পুরবৃদ্ধেরা আসিয়া বলিলেন—"মা, রক্ষা করো! যে পাণি মৃত্যু বরণ করচে, তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো, শান্তি হোক।"—এ অনুনয় সুমিত্রাকে মৃত্যুবরণ হইতে নিবৃত্ত করিল। তিনি মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে তিনদিন তপস্যা করিলেন। এই তপস্যার ভিতর দিয়া নিজেকে sublimate করিয়া তারপর বরণ করিলেন বিক্রমকে। মৃত্যুর জন্য যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহাকে সাক্ষী করিয়া বিক্রম-সুমিত্রার বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পর সুমিত্রা আগুনের শুচিতা, উজ্জ্বলতা, উর্ধ্বমুখীনতা ইত্যাদির আদর্শ মনে রাখিলেন। বিক্রমদেব রাণী সুমিত্রার আদর্শ সম্বন্ধে রহিলেন সম্পূর্ণই উদাসীন। বিবাহিত জীবনে সুমিত্রা ও বিক্রম অনুসরণ করিলেন দুই বিভিন্ন আদর্শ। ইহাতেই সূচনা হইল বিরোধের। বিবাহের সময়ে দেবতার কাছে সুমিত্রার প্রার্থনা ছিল—"রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়।" ইহারই পরিণাম হইল এই যে, যিনি রাজবধূরূপে রাজগৃহে আসিতেন, তিনি জালন্ধরে আসিলেন লোকমাতারূপে। কুলবধূর মধ্যে কল্যাণের স্নিগ্ধ শিখা জ্বলিয়া উঠিল। জালন্ধর-রাজ বিক্রম নিজেকে সুমিত্রার স্তরে উন্নীত করতে পারেন নাই। ইহারই পরিণাম হইয়াছে ট্র্যাজেডী।

সুমিত্রা বিক্রমকে বরণ করিয়াছিলেন দেশকে অত্যাচার নিপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য। সুমিত্রার বয়স তখন মাত্র ষোলো। ষোলো বছর বয়সেই সুমিত্রার মধ্যে নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রথম হইতেই তিনি জায়া ও জননী

হিসাবে প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। প্রেমে ও কল্যাণে বিক্রমের জীবনকে দুইদিক হইতেই ভরিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তিনদিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসিয়া, উপবাসের ভিতর দিয়া সুমিত্রা নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। অসহ্য অপমানকে দগ্ধ করিয়া তারপর তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন বিক্রমের রাজ-অন্তঃপুরে। যাহা স্থূল, যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ়, যাহা ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তাহাকে পুড়াইয়া, বিনিঃশেষ করিয়া নূতন তেজে জ্যোতির্ময়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তপস্যার শেষে সুমিত্রা পরিণত হন মাটির ঘরে স্বর্গের দীপশিখায়। তখন তিনি ভোগের কালিমামুক্ত, ত্যাগের উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত। সুমিত্রায় প্রথম হইতেই ত্যাগের সাধনা। বেদনা ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া বৃহৎজীবনে পদক্ষেপের ব্যাকুল বাসনা। ইহারই অন্যদিকে পাইয়াছি বিক্রমদেবকে —তাঁহার মধ্যে প্রেমের উন্মত্ত সৌন্দর্যকে জীবনে গ্রহণ করার দুর্বার বাসনা। মদনকে মিলনের কর্তৃত্বভার দিয়া মিলনের সার্থকতা অন্বেষণের প্রয়াস। ইহাতেই বিক্রম-সুমিত্রার মিলনে দৈবশাপ লাগিয়াছে, মিলন অসম্পূর্ণ হইয়াছে।

আত্মশুদ্ধির ভিতর দিয়া সুমিত্রা তপতী হইয়াছেন। তিনি যেন সাবিত্রীর আত্মজা, কুরুবংশীয় সম্বরণ রাজার স্ত্রীর মত রূপবতী এবং তপোনুরক্তা।

আলোকের দেবতা সূর্য—পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে তিনি জ্বালেন আঁধারনাশক জ্যোতিচ্ছটা। মানুষের জীবনে সেই দেবতার অসীম প্রভাব। তিনি নাশ করেন সমস্ত ক্লেদ ও মালিন্য, ঘুচাইয়া দেন আমাদের জড়ত্ব। পৃথিবীতে বহাইয়া দেন নির্মল মঙ্গলময় আলোর প্রবাহ। এই সূর্যদেবতারই কন্যা তপতী যেদিন পৃথিবীতে আসেন, তাঁহারও হৃদয়ে জাগরুক থাকে সেই সূর্যপিতারই আদর্শ।

সূর্যদেবের কন্যা তপতী তাই কোনকালে সহ্য করিতে পারেন নাই অমঙ্গলের, অসুন্দরের অস্তিত্ব। অমঙ্গল এবং পাপের কালিমা দেখিয়া তাঁহার আত্মা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীতে যখন অমঙ্গল ও পাপ স্ফীতকায় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সেই বীভৎসের কুৎসিতের রাজ্যে নিজেকে রাখিয়াছেন বিচ্ছিন্ন করিয়া। অন্ধকার পৃথিবীর শোভাযাত্রায় মিলাইতে পারেন নাই আপনাকে। যদি কেহ চাহিয়াছে মঙ্গলের পূজা, যদি কেহ চাহিয়াছে সুন্দরের আবির্ভাব —তবে সূর্যদেবের এই আত্মজা যাচিয়া মিশিয়াছেন সেই দলে। তাহার পর প্রতিবাদ করিয়াছেন অসুন্দরের। পিতার নিকট চাহিয়াছেন মনোবল, আহ্বান করিয়াছেন ন্যায়ের দেবতাকে। তপতী তাই সুন্দরের ও মঙ্গলের চারণকার।

এই তপতী আসিয়াছেন যুগে যুগে—আবির্ভূতা হইয়াছেন পৃথিবীকে কালিমামুক্ত করিবার জন্য। আসিয়াছেন দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারতে, আসিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের তপতী নাটকে। তিনি জ্যোতির্ময়ী, তাঁহার রূপের পবিত্রপ্রভা শাশ্বত, অম্লান। অথচ তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারেন নাই নৃপতি সম্বরণ, রাজা বিক্রমদেব। সম্বরণ তপতীকে পাওয়ার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তাঁহার অন্তরে ছিল অত্যুগ্র মোহের শিখা। সহস্র বৎসরের তপস্যাশেষে যেদিন তিনি লাভ করিলেন তপতীকে, সেইদিন তাঁহার অন্তরের তিমিরাগ্নি তাহার খাদ্য পাইল। তিনি বিস্মৃত হইলেন রাজকার্য, দূরে রহিল সুন্দর ও মঙ্গল। রাজ্যমধ্যে সৃষ্টি হইল অরাজকতার, জ্বলিয়া উঠিল অমঙ্গলের লেলিহান শিখা। সম্বরণ ইহা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু তপতীর মধ্যে ইহা সহ্য করিবার মত ধৈর্য ছিল না। অমঙ্গল ও উন্মত্ততার উপর ছিল তাঁহার বিরূপতা। তিনি জাগাইতে চাহিলেন সম্বরণের মধ্যে মঙ্গলবোধকে।

সেই সাধনায় সার্থক না হইলে তপতী নিশ্চয়ই চলিয়া যাইতেন সম্বরণকে ছাড়িয়া। কিন্তু তপতীর উন্নত মহান্ আদর্শ রাজা সম্বরণের চিত্তে সুন্দরের চেতনা জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইল। সম্ভোগের রাজ্য হইতে তপতী তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনিলেন লোকালয়ে, নৃপতি সম্বরণের রাজধর্মে।

রবীন্দ্রনাথের তপতীতে সমস্যা এমনই জান। তপতী নাটকের রাণীর বাণী —'এখানে নয়, তোমার প্রজাদের কল্যাণ-লক্ষ্মীর দ্বারে।' তপতী নাটকের রাণী উপলব্ধি করিয়াছেন— নর-নারীর সত্য সার্থক মিলনের পটভূমি মঙ্গল ও ত্যাগ ; মোহ নয়, নয় আপনার সুখসর্বস্ব চেতনা। মহাভারতের তপতীর মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের তপতীতেও নারীর যে চিরন্তনী শুভঙ্করী রূপ, তাহাই ফুটিয়াছে।

যে নারী আমাদের ভবসংসারের যজ্ঞবেদিকায় নিত্যসেবার হোমানল জ্বালিয়া দুই করপুটে আপন তনুমনপ্রাণ আহুতি দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিমানস বারবারই সেই নারীর বন্দনা করিয়াছে। সুমিত্রায় সেইরূপ এক নারীকেই উজ্জ্বল রঙে আঁকা হইয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর দুই রূপ। একজনা 'উর্বশী সুন্দরী, বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী।' এই নারী মানুষের কামনা বাসনাকে জাগাইয়া দেয়, কিন্তু বাসনার শান্তি আনে না।

গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় নিভৃত তার রয়েছে, নীরবে ঝঙ্কারের অপেক্ষায়—যে ঝঙ্কারে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।১

১। দুই বোন—রবীন্দ্রনাথ।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা দিয়া এই নারীকে কবি বলিয়াছেন 'বসন্ত-ঋতু'। এই নারী—

তপোভঙ্গ করি,
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুধাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি'—
দুহাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুক গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।১

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর আর এক রূপ রহিয়াছে। তাহা নারীর কল্যাণী রূপ।—

লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাদের জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।২

এই নারীকে কবি তুলনা করিয়াছেন বর্ষা ঋতুর সঙ্গে।—

জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।৩

এ নারী—

ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়,
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য-সুধায় মধুর।

১। দুই নারী—বলাকা॥ ২। ঐ॥ ৩। দুই বোন॥

ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে ।১

'ভগ্নহৃদয়' নামক কাব্য-নাটিকায়, চিত্রা কাব্যের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায়, বলাকার 'দুই নারী' কবিতায় নারীর দুই রূপই কবি আঁকিয়াছেন। 'দুই বোন' উপন্যাসেও তাই। মহুয়া কাব্যে প্রেমের প্রসাধনকলা ও প্রেমের সাধনবেগ উভয়কেই ফুটাইয়া সাধন-প্রেমেরই প্রশস্তি গীত হইয়াছে। এক নারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাহিরে বিকীর্ণ করিয়া দেয়—সে নারী শুধুই প্রেয়সী। অন্যজনা বিশ্বকে শিশিরস্নাত করিয়া, অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করিয়া তোলেন—এই নারী কল্যাণী ; ইনি নারী হইয়াও দেবীরূপিণী। এই যে নারী—যে নারীতে প্রেমের সাধনবেগ, সেই নারীর উদ্দেশ্যেই কবির শেষ গানটি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে ।২

এ নারীর—

তোমার নাই শীত বসন্ত,
জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তব নিত্য নব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে ।৩

১। দুই নারী—বলাকা ২। কল্যাণী—ক্ষণিকা। ৩। ঐ।

এই নারী মানুষের উদ্ধত বাসনাকে অনন্তের পূজামন্দিরের দিকে চালনা করেন। এমনই এক নারীকে আঁকা হইয়াছে 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রায়—'তপতী'র সুমিত্রায়। সুমিত্রা পরগতপ্রাণা, ত্যাগে মহাবীর্যবতী। সুমিত্রার প্রেম মমতা ও করুণার ধারাপ্রবাহ বহাইয়া সার্থক হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে।

জালন্ধর-রাজ বিক্রমদেব ইহা বুঝেন নাই বলিয়া রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবদত্তের সঙ্গে তাঁহার কথা-কাটাকাটি হইয়াছে।

> বিক্রম—তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট করে বলো, প্রজারা আমার নামে কি বলচে?
>
> দেবদত্ত—তারা বলচে, অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ায় ম্লান।
>
> বিক্রম— দুর্মুখ, প্রজারঞ্জনে আরেকবার সীতার নির্বাসন চাই না কি?
>
> দেবদত্ত—নির্বাসন তো তুমিই দিয়েচ তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ প্রজাদের: শুধু কি তিনি রাজবধূ? তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রমদেব ভুল করিয়াছিলেন এইখানে। রাণীর ভূমিকা যে কেবল রাজবধূর ভূমিকা নয়, লোকমাতার ভূমিকাও যে তাঁহার—ইহা তিনি মনে রাখেন নাই! তিনি প্রেমে কর্তব্যকে তুচ্ছ করিয়াছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে কর্তব্যকে আমল দিতে চাহেন নাই। সদর্পে রাণীর সম্মুখে বলিয়াছেন—

> বিক্রম—লোকে বলচে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেচি।

সুমিত্রার মন রাজার এই ভ্রান্তদৃষ্টিকে মানিয়া লইতে পারে নাই। তিনি রাজ-অন্তঃপুরবধূ হিসাবে মর্যাদা চাহিয়াছেন, আবার লোকমাতা হিসাবেও প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। নারীজীবনের চরম সার্থকতা সে লোকমাতা হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার ভিতর—একথা সুমিত্রা একবারের

জন্যও বিস্মৃত হন নাই। বরং বারে-বারেই একথাটা মনে করাইয়া দিতে চহিয়াছেন বিক্রমবেদকে।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে বিক্রম কাশ্মীরে গিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন—সুমিত্রার সাধনায়। প্রেমধর্ম প্রথম হইতেই তাঁহার দ্বারা উপেক্ষিত। অন্যদিকে সুমিত্রা প্রেমধর্মেরই মহিমা অম্লান রাখার জন্য প্রথম হইতেই সচেস্ট। তিনি রাজাকে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছেন কল্যাণের সাধনায়।

রূপমোহের বশবর্তী হইয়া বিক্রম আঘাত করিয়াছেন মঙ্গলকে, বিস্মৃত হইয়াছেন আপনাকে। সুমিত্রা চাহিয়াছেন—মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি নাই। বিক্রমের আসক্তির দুর্জয়তাকে পরিতোষ করিতে গিয়া সুমিত্রার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে। কিন্তু তবু তিনি আত্মবিস্মৃত হন নাই। জীবনের মহৎ ব্রত উপেক্ষা করিয়া তিনি কর্তব্যের আবিলতায় মগ্ন হন নাই। বিজয়ী বিক্রমের গর্বিত প্রস্তাবের কোন গ্লানি বিবাহের পর সুমিত্রার Sublimated চিত্তের প্রসন্ন মহিমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বিক্রমের আকাঙ্ক্ষা—সুমিত্রাকে তিনি পান ভোগের রাজ্যে। সুমিত্রার প্রার্থনা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁহার প্রার্থনা অনেকটা চিত্রাঙ্গদার মতো

আমি চিত্রাঙ্গদা

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।১

সুমিত্রা ঠিক এমনিভাবেই বলিয়াছেন —

আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না সিংহাসনের পাশে?...আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে।

তপতী নাটকে নারী পুরুষের পিছনে অর্থহীন ছায়ার মতো দাঁড়াইয়া নাই। নারী নিজেকে অন্তঃপুরের কোণে বন্দী করিয়া রাখে নাই। ভোগের কারাগারে রাজা বিক্রমদেবের বিলাসের সঙ্গিনী হইয়া থাকিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন সুমিত্রা। মহুয়ার নারীর মতই যেন বলিয়াছেন—

রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব
শান্তি না চাই, সান্ত্বনা নাহি চাব।

সুমিত্রায় সেই প্রেম, যাহা বলে —

দুঃখে-সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমির তোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্র নির্ঘোষ গভীর।

প্রেমকে তিনি স্বার্থের দ্বারা কলুষিত করিতে চাহেন নাই, ভোগসর্বস্বতায় কলঙ্কিত করিতে চাহেন নাই। প্রেমকে তিনি সংযমের সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রেমকে মোহ-বাসনায় পর্যবসিত হইতে না দিয়া, উহাকে জীবনসাধনায় নিয়োজিত করার দুর্জয়তা দেখাইয়াছেন। প্রেম যে ব্যক্তিজীবনের হইয়াও বিশ্বজীবনের তাহা প্রমাণ করার জন্য সুমিত্রার জীবন নিয়োজিত।

১। চিত্রাঙ্গদা।

যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেই জন্যই সে অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে। সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকে ছোট এবং বড়, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না।১

সুমিত্রার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এই আত্মসংবৃত প্রেম। তাঁহার কাছে এই প্রেমই ছিল সাধ্য এবং আরাধ্য। এইজন্যই জীবনচেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ—প্রেম তাঁহার কাছে জীবনচর্যারই নামান্তর। সুমিত্রার প্রেম বিশ্বের কল্যাণ চাহিয়াছে। জীবনতপস্যার দৃপ্ত কঠিনতা তাঁহার চরিত্রে।

সুমিত্রা ধৈর্য, কোমলতা ও করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁহার মধ্যে আশ্চর্য দৃঢ়তা। হীনতাকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার প্রেমে আত্মসমর্পণের ভাব—কিন্তু আত্মসমর্পণের সেই ভাবটি তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

সুমিত্রা ভোগের ভবনে নিজেকে বদ্ধ করেন নাই। রাজবৈভবের জালেও বাঁধা পড়েন নাই।—

বিক্রম—এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার। অন্তত একদিনের জন্যেও তাকে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করো।

সুমিত্রা—আমি তো তোমার আদেশ পালনে ত্রুটি করিনি—উৎসব যাতে সুন্দর হয়, আমি তো সেই আয়োজন করেচি। কিন্তু তোমারো কি কিছু করবার নেই? উৎসব যাতে মহৎ হয়ে ওঠে তুমি তাই করো, তোমার রাজমহিমা দিয়ে।

১। প্রাচীন সাহিত্য—কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।

বিক্রম—বলো, আমার কী করবার আছে?

সুমিত্রা—কাশ্মীর থেকে যে-সব লুব্ধের দল তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেচে, আজই সেই পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যাক।

বিক্রম—আমার এই বিদেশী অমাত্যদের 'পরে তোমার ক্রোধ আছে।

... ...

সুমিত্রা—তোমার স্বপক্ষে ওরা পাপ করেচে, ক্ষমা করতে হয় কোরো, কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় করচে তাও কি ক্ষমা করতে হবে? তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হচ্চে, তাতেও বাধা দেবে না?... আমার প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঙ্গপালগুলো যদি কোনো অপরাধ না করেও থাকে তবু ওরা আমার রাত্রিদিনের লজ্জা! আমাকে তার থেকে বাঁচাও।

বিক্রম—দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয়, এই কথা মনে রেখো।

সুমিত্রা—মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই, এ কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই।

প্রস্থান

বিক্রম—শুনে যাও, মহিষী।

সুমিত্রা—[ফিরে এসে] কী বলো।

বিক্রম—তুমি জাগচো না কেন? কিসের এই সূক্ষ্ম আবরণ? আমার সমস্ত রাজার শক্তি নিয়ে একে সরাতে পারলেম না। আপনাকে প্রকাশ করো—দেখা দাও ধরা দাও। আমাকে এই অত্যন্ত অদৃশ্য বঞ্চনায় বিড়ম্বিত কোরো না।

সুমিত্রা—আমিও তোমাকে ঐ কথাই বলচি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্চিনে—তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগো নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেচো কাশ্মীর থেকে—সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও—আমাকে রাণীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি—তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুশি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে।

সুমিত্রা—ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার রাজকোষ তোমারি থাক। আমার দেহের অলঙ্কার থাক আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজা রক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে, তবে এ সব তো বন্দিনীর বেশভূষা—এ আমি বইতে পারবো না। মহিষীকে যদি গ্রহণ করো সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী? সে আমি নই।

বিক্রম ও সুমিত্রার জীবনবীণার তারে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই সুর বাজিয়াছে। সে মিলনে সঙ্গীতের কল্যাণী বাণী ঝঙ্কৃত হয় নাই; তাই আক্ষেপে বিক্রম ফাটিয়া পড়িয়াছেন—মিলনের ব্যর্থতা দেখিয়া তিনি হইয়াছেন বিস্মিত।

বিক্রম—পেয়েচি বীণাটিকে। সঙ্গীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে। সুর মেলাতে পারচিনে, পেয়েও হার হচ্চে পদে পদে।

বিক্রমদেব প্রেমকে সম্বল করিয়া জয়ী হইতে চাহেন নাই, শক্তি-দম্ভে সুমিত্রার মন জয় করার সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়া-ছিলেন—নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তিনি সুমিত্রাকে বিস্মিত করিয়া দিবেন। সুমিত্রা যাহা চাহিয়াছিলেন, বিক্রম তাঁহাকে তাহা দিতে পারেন নাই। রমণীকে মহিষীর উচ্চাসনে বসাইতে পারেন নাই; এইজন্যই সুমিত্রা বরাবরই বিক্রমের সম্মুখে উদাসীনা থাকিয়াছেন।

সুমিত্রার যাহা প্রার্থনা, তাহা অতিশয় স্পষ্টই ছিল। কিন্তু বিক্রম কিছুতেই তাহা ধরিতে পারেন নাই।—

সুমিত্রা—তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্চি নে।

দুজনের বিবাহিত জীবনের আদর্শের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। বিক্রম চাহিয়াছেন, নিষ্কাম প্রেমকে সকাম প্রেমের সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত করিতে। সুমিত্রা ভোগের গণ্ডিতে প্রেমের লজ্জা খুঁজিয়া পাইয়াছেন;

বলিয়াছেন—প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয়, তবে তার চেয়ে বিনাশ কী হতে পারে? সুমিত্রার প্রেমে দুঃখের দুরূহ তপস্যা—সে প্রেম দুঃখের ভিতর দিয়া, ত্যাগের মধ্য দিয়া সার্থকতা খুঁজিয়াছে।

বিক্রমের প্রেমে শুধুই উন্মাদনা, শুধুই মত্ততা। সে প্রেম মানুষের যৌবন-প্রবৃত্তিকে ঘরছাড়া দিশাহারা করিয়া অনির্দিষ্ট যাত্রার পথে উধাও করিয়া লইয়া যায়—তাহা শুধুই অবাধ গতির মত্ততা আনে চিত্তের মধ্যে। উহার মধ্যে শান্তি নাই, কল্যাণ নাই—মাধুর্য নাই। তাহা অতৃপ্ত মানবপ্রবৃত্তির উন্মাদনাক্রান্ত তপ্ত ললাটের উপর কল্যাণের স্নিগ্ধতাটুকু সঞ্চার করিতে অসমর্থ।

সুমিত্রার প্রেম সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সুমিত্রা যে-প্রেমের ভাবমূর্তি, তাহা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়—সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।১

বিক্রমের প্রেম পুরাপুরি ঐহিক। 'যে আদি শক্তির বন্যার উপর ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ, সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ' ছিল বিক্রমের প্রেমে। সুমিত্রায় সেই প্রেম, যাহা বলে—

সঙ্কটবন্ধুর দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

ইহজীবনের দ্বন্দ্বের মাঝখান হইতে তিনি সরিয়া যান নাই। নিপীড়িত প্রজার কান্নার ধ্বনি দিনরাত তাঁহার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হইয়া বেড়াইয়াছে। গুমরে ওঠা দুঃখসমুদ্রের ধ্বনি শুনিয়া তিনি বিহ্বল

১। শান্তিনিকেতন—রচনাবলী ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৪৪৮।

হন। প্রজারা জোরের সঙ্গে তাহাদের অধিকার আদায় করুক, ইহা তিনি চাহিয়াছেন।

সুমিত্রা—ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে—কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করচে কেন, ভীরু সব! বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না, তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙে ফেলুক না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড় জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, ততো বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চাবার অধিকার। আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত—মহারাণী, তোমার নিজের জায়গায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে, তোমার আসন যেখানে, তোমার শক্তি সেইখানেই।

সুমিত্রা—আমার আসন! আমার আসন আমি পাই নি। অহর্নিশি সেই শূন্যতা সইতে পারচি নে। মন কেবলি বলচে, রুদ্র ভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান—দেখিয়ে দিন তিনি পথ, ভেঙে দিন তিনি বিঘ্ন, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উদ্ধার করুন।

যে রাজ্যে উৎপীড়ন-অবিচার—যেখানে মানুষের হাতে মানুষ অকারণে লাঞ্ছিত, সে রাজ্যের রাণী থাকার লজ্জা সুমিত্রা সহ্য করিতে পারেন নাই। নারীর হাতে যে জীবনের সোনার কাঠি, তাহা সুমিত্রার মধ্য দিয়া স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

সুমিত্রার সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলা ও কবির নিজেরই সৃষ্ট যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রের তুলনাও চলে। কালিদাসের শকুন্তলা যেমন করিয়া তপোবনের তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া সেখানকার হরিণশিশুটি পর্যন্ত সকলের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছিল; তরুলতা, পশুপাখী সকলের সেবা-যত্নের ভিতর দিয়া শকুন্তলা যেমনভাবে নিজের জীবনকে সার্থক করিয়াছিল—সুমিত্রাও তেমনিভাবে নিজের জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সুমিত্রা যোগাযোগের কুমুর মতই মমতা-করুণার প্রতিচ্ছবি। কুমু সেই

নারী, যে-নারী সংসারের সর্বত্র আপনাকে বিলাইয়া দেয়, মূক অসহায় জীব যাহারা তাহাদিগকেও যে আপন হৃদয়ে সযত্নে স্থান দেয়। সকলের বেদনায় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে সে কখনই নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে নাই। আপন সত্তাকে নিজের সুখদুঃখের সীমাটুকুর মধ্যে বন্দী করিয়াই রাখে নাই।

রবীন্দ্রনাথের কুমু কোমল, কিন্তু তেজস্বিনী। জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার সতেজ চিত্ত ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নত করে নাই। কুমুর স্বামী মধুসূদন ভাবিয়াছিল, ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে চাটুজ্জেদের বাড়ীর মেয়েকে সে অভিভূত করিয়া দিবে। কিন্তু ঐশ্বর্যের অহঙ্কারের কাছে কুমু মাথা নত করে নাই। সুমিত্রাতেও এই ভাব।

একটুখানি সংযম এবং অন্তর্দৃষ্টি—মধুসূদনের প্রেমকে অম্লান রাখিতে পারিত, কিন্তু কর্তৃত্বের অভিমান, অসংযম সেই প্রেমকে ব্যর্থতার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। রাজা বিক্রম যে সুমিত্রাকে হারাইয়াছিলেন, তাহার মূলেও এই ভাব। সংযমের অভাব, প্রবৃত্তির উদ্দামতা বিক্রমের জীবনে ব্যর্থতাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

রাজা ও রাণীতে বিক্রমের আসক্তির প্রচণ্ডতা সুমিত্রাকে পুরাপুরি পাওয়ার বাধা হইয়াছিল। কিন্তু তপতীকে কবি আরও নিগূঢ় একটি কারণ দিয়াছেন। এই নূতন নাটকের প্রারম্ভেই কবি সুমিত্রা ও বিক্রমকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই স্তরে। মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে তিনদিন পূজার ভিতর দিয়া সুমিত্রা নিজেকে sublimate করিয়াছিলেন। বিবাহের প্রথম দিনেই সুমিত্রার মধ্যে ঘটে বসন্ত ও বর্ষা ঋতুর সমন্বয়। সুমিত্রা প্রথম হইতেই বসন্ত ও বর্ষার সমন্বিত মূর্তি। বিক্রমদেব এই নারীকে নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন ভোগের গণ্ডির মধ্যে। ইহাতেই শুরু হয় বিরোধের এবং পরিণাম হয়

মহাদুঃখের। আত্মশুদ্ধির ভিতর দিয়া, sublimation-এর দ্বারা সুমিত্রা যেদিন নিজেকে জীবনের সাধারণ স্তর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা স্তরে লইয়া যান, সেইদিন সূচনা হয় বিরোধের। রাজা ও রাণী নাটকে এই ভাবটি নাই। ইহা তপতী নাটকের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব।

কঠিনতম কৃচ্ছ্রসাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া আপন তপস্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন সুমিত্রা। তাঁহার আশা ছিল বিক্রমের মোহের আবরণ তিনি মোচন করিতে পারিবেন। তাঁহার স্বপ্ন ছিল বিক্রমের সকাম প্রচণ্ড প্রেমকে তিনি ত্যাগপূত করিতে পারিবেন, সে প্রেমে কল্যাণের দীপ্তিচ্ছটা ফুটাইতে পারিবেন। বজ্রকে বারিধারায় পরিণত করিতে পারিবেন। বিক্রমের মধ্যে পুঞ্জীভূত ছিল রিক্ততার বেদনা—সেখানে পূর্ণতার আনন্দপ্লাবন তিনি বহাইতে চাহিয়াছিলেন। সৌন্দর্যের মোহে যিনি কল্যাণচেতনা-বিরহিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে চাহিয়াছিলেন কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে।

রাজা ও রাণী এবং তপতীর কাহিনী একরূপ ভাবে অগ্রসর হয় নাই। তপতীতে পূজার ভিতর দিয়া সুমিত্রার আত্মোপলব্ধি বা জাগরণ। রাজা ও রাণীতে বিক্রমের প্রচণ্ড আসক্তির সম্মুখীন হওয়ার পর রাণী সুমিত্রার নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রেয়সীরূপে যিনি রাজগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বিক্রমের বাসনাতরঙ্গের অভিঘাতে তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন কল্যাণীতে। অতঃপর রাজাকে তিনি কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। একদেশদর্শী কর্তব্যবিরহিত প্রেমের ব্যর্থতা বিক্রমকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহাতে রাজা ও রাণীর সুমিত্রা মানবীরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন, তপতীর সুমিত্রার মত দেবীত্বের পর্যায়ভুক্ত হন নাই। তপতীর সুমিত্রা পুরাপুরি ভাবমূর্তি, একটা অধ্যাত্মজীবনের

মহিমা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ সৌন্দর্যপ্রতিমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানসী কাব্যে বলিয়াছিলেন—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে
দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিও না তব
মলিন পরশে।

রাজা ও রাণীর সুমিত্রা মানবী হইয়াও প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। প্রেমের মর্যাদা রক্ষার শক্তি আহরণ করিতে চরিত্রটিকে মার্তণ্ডদেবের পূজায় বসিতে হয় নাই। এইজন্যই বলিতে হয় রাজা ও রাণীর সুমিত্রা মর্ত্যলোকের, তপতীর সুমিত্রা কল্পলোকের।

তপতী নাটক সুমিত্রার সাধন-প্রেমের কাহিনী। মোহাচ্ছন্ন বিক্রমের নৃশংস অত্যাচার হইতে কাশ্মীরের প্রজাপুঞ্জকে বাঁচাইতে গিয়া তাঁহার বিক্রমদেবকে বরণ। বিক্রমের যে-পাণি মৃত্যু বর্ষণ করিতেছিল, তাহাকে তিনি রোধ করার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এ সবই সাধন-প্রেমের লক্ষণ। সুমিত্রা লোকমাতা হিসাবে পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন। সেই সুমিত্রাকে রাণীর আসন না দিয়া বিক্রম তাহাকে কামনার আশ্লেষে বিলাসের গণ্ডির মধ্যে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে সুমিত্রা খুঁজিয়া পাইয়াছেন নারীত্বের অপমান। বিশেষত, কাশ্মীর হইতে আগত কর্মচারীদের অত্যাচারে জর্জরিত জালন্ধরের আর্তনাদে, সুমিত্রার চিত্ত হইয়াছে ক্ষতবিক্ষত। সতীতীর্থের তীর্থযাত্রীদের নিকট কর আদায় এবং সতীধর্মের অবমাননার সংবাদে রাণীত্বের অক্ষম পরিহাস তাঁহার কাছে অসহ্য বলিয়া ঠেকিয়াছে।

জালন্ধরের রাজগৃহে পদার্পণ করার আগে যে মহান্ ব্রত সুমিত্রা লইয়াছিলেন তাহা হইতে কখনোই তিনি বিচ্যুত হন নাই।

মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে রাজকুমারী লইয়াছিলেন প্রজার কল্যাণ-সাধনের ব্রত। তারপর বিক্রমের সঙ্গে তিনি তাঁহার সম্বন্ধকে সহজ, সুন্দর ও নিবিড় করিয়া তুলিতেই চাহিয়াছিলেন। দুজনের জীবন কল্যাণের মহিমা অম্লান থাকিবে, ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য। কিন্তু তাঁহার সেই শুভ চেষ্টা সার্থক হয় নাই। তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রজাদের দুঃখ ও মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতেই নিরুপায় হইয়া তিনি বেশ পরিবর্তন করিয়াছেন। রাজরাণী হইয়াছেন তপতী। যিনি রাজার জীবনসঙ্গিনী হইয়া রাজ্যের মিত্র হইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া হইলেন তপস্বিনী। তপতী নাটকের রাণী একবার সুমিত্রা—প্রথমে সকলের সঙ্গে মিত্রতা বা আত্মীয়তার বন্ধনে নিজেকে বাঁধিবার প্রয়াস। অন্যদিকে তিনিই আবার তপতী—বিক্রমকে রাজধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া অভীষ্ট লাভ করার জন্য তাঁহার চেষ্টা। যখন দেখিয়াছেন যে, ইহজীবনের শুভকামনা ও শুভচেষ্টায় বিক্রমকে রাজধর্মে দীক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইল না, তখন কঠোর তপস্যায় দেবতাকে প্রসন্ন করিবেন—ইহাই হইল তাঁহার সঙ্কল্প।

বিক্রমের মায়াস্বপ্ন ভাঙাব জন্য সুমিত্রা তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি চিরজীবন ধরিয়া তপস্যা করিয়াছেন। চিরজীবন ধরিয়া বিক্রমকে কেবলই জানাইতে চাহিয়াছেন—'ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর পরম গৌরব, চরম সৌন্দর্য নহে।'

তপতী যেন কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের ধ্যানে আত্মস্থ পার্বতী। দুশ্চর তপস্যা শুরু করিয়া পার্বতী যেভাবে আত্মস্থ হইয়াছিলেন—যেভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব!" সেই ভাবই যেন তপতীতে আরোপিত।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের পার্বতীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী'। পার্বতী রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন এবং 'ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্য রূপতাম্'—তিনি আপনার রূপকে সফল করিতে ইচ্ছা করিলেন। রূপকে সফল করিতে হয় কী করিয়া? সাজে সজ্জায় বসনে অলঙ্কারে? সে পরীক্ষা তো ব্যর্থ হইয়া গেছে।

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং।
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ॥

তিনি তপস্যা দ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবারে গৌরী তরুণার্করক্তিম বসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপল্লব এবং অলকে নবপল্লব পরিলেন না, তিনি কঠোর মৌঞ্জী মেখলা দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।১

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের পার্বতীর মধ্যে কবি যে ভাবটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই ভাবচ্ছবিই তপতীতে।

তপতীর রাণী ভাবিয়াছিলেন, রাজার সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেই বুঝি বা রাজার মোহবন্ধ ছিন্ন হইবে, রাজার জাগরণ ঘটিবে। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া প্রেম হয়ত বা পূজামূর্তি ধারণ করিবে।

বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম—
দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।২

সুমিত্রা চাহিয়াছেন—বিক্রমের আসক্তির বন্ধন ভাঙিয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিবেন। প্রজার মঙ্গল-সাধনের ব্রতে তাঁহাকে জাগাইবেন, বিক্রমদেবকে রাজার কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করিবেন। সুমিত্রা

১। প্রাচীন সাহিত্য—কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। ২। মহুয়া—অন্তর্ধান।

ভাবিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে বিক্রমের অন্তরে আসক্তির বহ্নি নিভিয়া যাইবে—তাঁহার দীর্ঘদিনের ভ্রান্তি ঘুচিবে। রাজার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেই রাজার মোহ দূরীভূত হইবে।

কিন্তু বিক্রম রাণীকে ভুল বুঝিয়াছেন। রাণীর এই শুভচেষ্টাকে তিনি মনে করিয়াছেন দর্পিণীর উপেক্ষা। বিক্রমের আহত কামনা তখন ধ্বংসের উদ্দীপনায় দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

কাশ্মীরের বুকে বীভৎস বর্বরতার লীলা চলিল—রাজার অসংযত প্রবৃত্তি হিংসার মধ্যে দুর্বার হইয়া উঠিল। সুমিত্রা ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আগুনে আত্মাহুতি দিয়াছেন। এই আহুতিতেই নাটকখানির সমাপ্তি। কঠোরতম আঘাতের ভিতর দিয়া জালন্ধররাজ বিক্রমকে সত্যের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিবার জন্য সুমিত্রার এই আত্মাহুতি।

নাটকের আগাগোড়াই দুই বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্ব বেশ সুস্পষ্ট হইয়াই আছে। প্রেমের উত্তেজনায় স্বতন্ত্র হইয়া বিক্রম জীবনযাপন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সুমিত্রার আদর্শ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সকলের সঙ্গে যোগের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন সার্থক হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে। বৃহৎ জগতের দুঃখ এবং প্রজার মঙ্গলকে একবারের জন্যও তিনি বিস্মৃত হন নাই। বিক্রম কর্তব্যবিমুখ—সুমিত্রা কর্তব্যের গৌরব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর।

যে উদ্যানে ঋতুরাজের অধিকার, সেই উদ্যানে প্রজাপুঞ্জের বেদনা ও আবেদন পৌঁছাইয়া দিয়াছেন সুমিত্রা। বিক্রমের কাছে সুমিত্রার প্রত্যাশা ছিল অনেক। মীনকেতনের উৎসব মহৎ হইয়া উঠিবে ইহাই ছিল সুমিত্রার প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশার পূরণ হয় নাই বলিয়াই নাটকখানির অনিবার্য পরিণাম হইল ট্র্যাজেডী। নাটকখানিতে দেখানো হইয়াছে কলুষিত প্রেম—"becomes sooner

or later retrospected, tomb of death, not a well-spring of new life."[১]

সৌন্দর্যতরণীর উপর বাসনার বোঝা চাপাইতে গেলে তরী ডুবিয়া যায়—ইহা দেখানোর জন্য তপতী নাটকখানি রচিত। নাটকের করুণ উপসংহার দুঃখভোগীর স্বভাবের দ্বারা সৃষ্ট—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রূপমোহ এবং চারিত্রিক উদ্দামতার জন্য রাজা বিক্রমদেব সুমিত্রাকে হারাইয়াছেন।

আত্মবিস্মৃত বিক্রমের নবজীবন লাভের জন্য অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। ইহাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য নাটকের শেষে সুমিত্রার আত্মাহুতি।—

> তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়
> হারিয়ে তাই পেলাম তোমায় পূর্ণ করে।[২]

এই জিনিসটি দেখানোর জন্য সুমিত্রার মৃত্যুবরণ। 'রাজা ও রাণী'তে বিক্রমের নির্যাতন-নিপীড়নে নাটকের গতি যখন ভারাক্রান্ত, তখন সহোদর কুমারের ছিন্নমুণ্ডের উপচার হাতে লইয়া সুমিত্রার প্রবেশ ও মৃত্যু ঘটিয়াছে। 'রাজা ও রাণী' নাটকের শেষে একাধিক মৃত্যু। তপতীতে এভাবে একাধিক মৃত্যুর অবতারণা করা হয় নাই। বিক্রমদেবের রোষবহ্নি হইতে নির্যাতিত প্রজাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে সুমিত্রার আত্মাহুতি এ নাটকে আছে। এ নাটকে রাজার মোহগ্রন্থি ছিন্ন করার জন্য সুমিত্রার মৃত্যুবরণ।

আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে—তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাবো।

১। Bertrand Russell. ২। শেষ সপ্তক —১ নং কবিতা॥

ইহাই তপতী নাটকের মূল প্রতিপাদ্য।

সুমিত্রার মৃত্যুর ভিতর দিয়া সত্য ও কল্যাণের আবাহন দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে তপতী নাটকে।

বিক্রমের আত্মঘাতী প্রবৃত্তিকে তপতী নাটকের ট্র্যাজেডির মূলে রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, বিক্রম-সুমিত্রার বিপরীত জীবনবোধের সংঘাত হইতে এ নাটকের ট্র্যাজেডির সৃষ্টি। বিক্রম চরিত্রের ভ্রান্তির মধ্যে ট্র্যাজেডির বীজ ছিল। বিক্রমের ভ্রান্তি প্রেমকে দেহসর্বস্ব মনে করা, নারীর চিরকালীন সংস্কারকে বিস্মৃত হওয়া। নারী যে কেবল প্রিয়া নয়, সে যে জননী কল্যাণী—একথা বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিক্রমের এই ভুলের ফসল তাঁহার জীবননাট্যের অন্তিম অঙ্কে আসিয়া সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু নাটকের ত্রুটি এইখানে যে—এখানে রূপমোহের দুর্বলতা আর তাহার পরিণাম দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু বিয়োগান্তক নাটকে বিয়োগের মধ্য দিয়া যেমন করিয়া দয়া ও করুণার মধ্য দিয়া মানুষের অন্তরকে বিধৌত করিয়া হৃদয়ে একটা শুচিশুদ্ধ ভাব আনিয়া দেওয়া হয়, তপতী নাটকে তাহা নাই। শেক্‌স্‌পীয়ার যেমন জীবনের নিষ্ফলতা দেখাইয়া উহার মধ্যেও পরিত্রাণের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন, সে ইঙ্গিতটুকু এই নূতন নাটকে বেশ সুস্পষ্ট নহে। কবির অবশ্য উদ্দেশ্য এই ছিল যে সুমিত্রার কায়া হারাইয়া বিক্রম নিজের অন্তরে নিজেকে খুঁজিয়া পাইবেন। পরমা শান্তির মধ্যে সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ জিনিসটির সমস্তটাই এই নূতন নাটক তপতীতে অব্যক্তের আবছায়ায় রহিয়া গিয়াছে। রাজা ও রাণী নাটকে সুমিত্রা আত্মবলি দিয়া বিক্রমের অন্তরে এক মর্মন্তুদ জ্বালার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মোহের অন্ধকার হইতে সেখানে রাজা যে মুক্ত

হইয়াছেন, সে ইঙ্গিতটুকু বেশ পাওয়া গিয়াছে। বিক্রম সেখানে বলিয়াছেন—

> দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
> তাই বলে মার্জনাও করিলে না ?' রেখে
> গেলে চির-অপরাধী করে ? ইহজন্ম
> নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
> ক্ষমা তব, তাহারো দিলে না অবকাশ ?
> দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
> অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান ॥

কিন্তু তপতীতে সুমিত্রার মৃত্যু কেবল ক্ষতির খাতায় লেখা একটি অঙ্কমাত্র হইয়া আছে। রাজা ও রাণীতে সুমিত্রার প্রেমের জয় দেখানো হইয়াছে। প্রেমের গৌরব সেখানে প্রদর্শিত। তপতীতে প্রেম যে পরাভবহীন—এ সত্যটি দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু বিক্রম সেই সত্যটি বুঝিতে পারিলেন কি না, তাহার আভাস পাওয়া যায় নাই। সুমিত্রার চিতাধূম দেখিয়া বিক্রমের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে—এ জিনিসটি এই নূতন নাটকে অনুমান করিয়া লইতে হয়। সুমিত্রার আত্মাহুতি এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণের আড়ালে এই ইঙ্গিতটিকে রাখা হইয়াছে—এই মাত্র। এ নাটকের উপসংহার-ভাগে সমস্তটাই ব্যঞ্জনাময় হইয়া আছে।

নাটকে অন্য সমস্ত চরিত্রের মধ্যে নরেশ বিপাশার চরিত্র দুইটি চমৎকার ফুটিয়াছে। নরেশ রাজা বিক্রমকে কর্তব্য অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছে। বিপাশার প্রতি তাহার সুগভীর অনুরাগ।

নরেশ-বিপাশার প্রেমে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ রহিয়াছে। যে প্রেম আপনার মধ্যে আপন বাসনাকে রুদ্ধ করিয়া একটা আত্মিক আনন্দে চরিতার্থতা লাভ করিতে চায়, নরেশ বিপাশার প্রেম সেই শ্রেণীর—

এ প্রেমে 'পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে' বাসররাত্রি রচনার কোন সাধ নাই, এ প্রেমে আত্মদমন ও অসীম ধৈর্য। এ প্রেমের বেদনা যেমন গভীর স্তব্ধ উদার—সুখও তেমনি সহজ শান্ত সরল। নরেশ-বিপাশার প্রেম শুধু যে মিলনকে প্রখর করিয়াছে তাহা নহে, বিচ্ছেদকেও দুঃসহ সুন্দর করিয়াছে। এ প্রেমে কথার চেয়ে স্তব্ধতা বেশী মুখর। বেগের চেয়ে বিরতি বা ব্যাহৃতি বেশী সক্রিয়। এ প্রেমে অপ্রকট অথচ অকপট। দেহ সেখানে অনুপস্থিত—শুধুই মনের ঢেউয়ের ঘূর্ণিপাক।

নরেশকে কবি করিয়াছেন যেন পদ্মের কুঁড়ি। স্ফুটতা তাহার প্রেমের লক্ষণ নয়। অন্তরের মধ্যে বিপাশার ধ্যানে সে তন্ময়।

তপতী নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেন একটা প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন—প্রশ্নটি এই যে, জীবনে প্রাপ্তির আনন্দটাই বেশী, না অপ্রাপ্তির বেদনার মূল্যটাই বেশী?'

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তাহা যে মানবজীবনে সত্য নয়—এই জিনিসটি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে কবির তপতী নাটকে। মোহান্ধকার জীবনের ছোট গণ্ডি নাটকখানিতে ধিক্কৃত হইয়াছে—'বিকারের মরীচিকা-জাল' ভেদ করিয়া প্রেমচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার পথনির্দেশ করা হইয়াছে। যে প্রেমের ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, বৈরাগ্যের দিকে, রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই প্রেমের জয়গান। সমস্ত মোহমলিনতা ধুইয়া ফেলিয়া পরম-অমৃতে, রাগরমণীয় অমল-সুন্দরে যুক্ত হওয়ার জন্য তপতী নাটকের প্রেম সম্মুখপানে আগাইয়া গিয়াছে। অনন্তের পূজা-মন্দিরের দিকে এ প্রেমের অগ্রস্থতি। তপতী নাটকে প্রেমকে আত্মজয়ের বেদনায়, সংযমের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা হইয়াছে। এ নাটকে 'রূপলালসা'কে অনুতাপ-তপস্যার ভিতর দিয়া 'প্রেমে' পরিণত করা হইয়াছে। মহুয়া কাব্যে প্রেমকে কামনা

হইতে মুক্ত করিয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের গতির সঙ্গে যুক্ত ক
হইয়াছিল। তপতী নাটকেও সেই ভাব। জীবনের মধ্যে অনির্বচনীয়ে
দেখানোর জন্যই যে তপতী নাটকখানি রচিত হইয়াছিল, একথ
নিঃসংশয়েই বলা চলে।